ক বিভাগ ❐ সামাজিক কর্ম গবেষণা (Social Work Research

একক ঃ ১ সামাজিক গবেষণা (Introduction to social Research)

১.১ সামাজিক সমীক্ষার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, বিষয়সমূহ এবং ঐতিহাসিক পটভূমি।

১.২ সামাজিক গবেষণার অর্থ, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য, পরিধি।
ভারতে সামাজিক কর্ম গবেষণার অবস্থা। সামাজিক কর্ম গবেষণার সীমাবদ্ধতা। সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কর্ম গবেষণার মধ্যে পার্থক্য। সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে পার্থক্য।

১.৩ সামাজিক কর্ম গবেষণার প্রক্রিয়া
অর্থ বা ধারণা
গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ
গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ

১.৪ প্রকল্প বিধিবদ্ধকরণ
অর্থ বা ধারণা
উপযোগিতা
প্রকল্প যাচাই বা পরীক্ষা
উপযুক্ত পরীক্ষার মান নির্ণয়
একটি ভাল প্রকল্পের গুণাবলী

১.৫ গবেষণার রূপরেখা
অর্থ
উপাদান সমূহ

১.৬ নমুনাকরণ বা নমুনাচয়ন
অর্থ ও গুরুত্ব
নমুনা চয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলী
নমুনা নির্বাচনের তত্ত্ব
নমুনাকরণ পদ্ধতির গুরুত্ব
নমুনাকরণের পদ্ধতিসমূহ
নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যবহারে সাবধানতা

নমুনাকরণের নির্ভরযোগ্যতা
নমুনাগত ও নমুনা বহির্ভূত ত্রুটি

১.৭ উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ
তথ্য সংগ্রহের ধরন
সুবিধা ও অসুবিধা
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ
তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

১.৮ গবেষণার প্রতিবেদন লিখন

সামাজিক সমীক্ষা ও সামাজিক গবেষণা
(Social Survey and Social Research)

১.১ সামাজিক সমীক্ষা (Social Survey)

(ক) সংজ্ঞা (Definition) : সামাজিক সমীক্ষার একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া খুবই দুরূহ। কারণ সামাজিক সমীক্ষার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। তাই যেকোনও একটি সংজ্ঞা সাধারণভাবে এর উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করতে অসমর্থ হয়। বস্তুত: সামাজিক সমীক্ষার যে বিভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায় তা দু'চার কথায় সংজ্ঞায়িত করা বাস্তবিকই অসম্ভব। কারণ আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ধ্রুপদী দারিদ্র্য সমীক্ষা থেকে বর্তমান যুগের নগর-পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমীক্ষা বা বাজার গবেষণা বা জনমত সমীক্ষা বা সরকারী বিভাগ দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য সমীক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

আবার উদ্দেশ্যের নিরিখেও এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ একটি সমীক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের রূপায়ণ বা কোন ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা বা কোন সামাজিক তত্ত্বের উপর নতুন করে আলোকপাত করা। আবার এটিকে যখন বিষয় হিসাবে দেখা হয় তখন এটি অন্তর্ভুক্ত থাকে। জনবণ্টনের চরিত্র, সামাজিক পরিবেশ, বিভিন্ন কার্যকলাপ বা কিছু মানবগোষ্ঠীর মতামত ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী।

1935 সালে **ওয়েলস্** (Wells) সামাজিক সমীক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা হল—"প্রধানত: শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ উদঘাটনজনিত ও সমাজের প্রকৃতি ও সমস্যা সংক্রান্ত সমীক্ষা" কিন্তু এই সংজ্ঞাটিকে কোনোভাবেই সম্পূর্ণ বলা যায় না। বর্তমানে সামাজিক সমীক্ষা আরো ব্যাপক

অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ সামাজিক সমীক্ষা একদিকে যেমন বিভিন্ন সরকারী সমীক্ষা, বাজার গবেষণা ও জনমত গবেষণার সাথে যুক্ত তেমনি সমাজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার বিভিন্ন দিকের সাথেও যুক্ত। সুতরাং সামাজিক সমীক্ষার সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় 'প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে বা কোন ঘটনা ঘটার পিছনে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক (cause-effect relationship) রয়েছে তা অনুধাবন করা বা কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ও সমাধান সংক্রান্ত যে গভীর সমীক্ষা বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চালানো হয়, তাকেই সামাজিক সমীক্ষা বলে।

(খ) সামাজিক সমীক্ষার উদ্দেশ্য (Purpose of social survey) : কতকগুলি সামাজিক সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল সমাজ সম্পর্কিত কতকগুলি তথ্য তুলে ধরা ও স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের সেগুলি সরবরাহ করা। অর্থাৎ এধরনের প্রতিটি সমীক্ষার একটি স্পষ্ট ও **বিবরণমূলক উদ্দেশ্য** থাকে। অনূরূপভাবে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর কাছে সামাজিক সমীক্ষার যেমন বিবরণমূলক উদ্দেশ্য থাকে তেমনি সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থাও সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কিত প্রকৃত ধারণা পাওয়ার উপায়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক বিষয় এই উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, বিভিন্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারগুলি তাদের আয় কিভাবে ব্যয় করে, শিক্ষার সাথে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক কি, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কি—এরূপ অসংখ্য বিষয়।

তবে একথা মনে করা ঠিক নয় যে সামাজিক সমীক্ষার উদ্দেশ্য সবসময়ই বিবরণাত্মক। অনেক সামাজিক সমীক্ষারই উদ্দেশ্য বিবরণমূলকের পরিবর্তে **ব্যাখ্যামূলক।** এরূপ সমীক্ষা সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বমূলক। সমাজ বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রকল্প (hypothesis) পরীক্ষা করা বা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তত্ত্বের প্রভাব পরিমাপ করা। যাই হোক্ না কেন, এধরনের সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সহগের (variables) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাই এরূপ সমীক্ষায় অত্যন্ত জটিল ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে সামাজিক সমীক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়:

(1) সমাজ ও সমাজগঠনকারী বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা তুলে ধরা;

(2) কোনো সামাজিক সমস্যার কারণ খুঁজে বের করা;

(3) কোনো সামাজিক ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করা;

(4) সমাজের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করা;

(5) সমাজবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের প্রভাব সমাজের উপর কতখানি ক্রিয়াশীল তা পরিমাপ করা;

(6) অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা ও সর্বোপরি কোনো তত্ত্ব গঠন করা।

(গ) সমীক্ষার বিষয়সমূহ (Subject matter of surveys) :

যদিও সমীক্ষার বিষয়সমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব তবুও সমীক্ষার চারটি প্রধান বিষয় হল:

(1) একটি জনগোষ্ঠীর জনবণ্টনমূলক চরিত্র অর্থাৎ পরিবারের গঠন, বৈবাহিক মর্যাদা, বয়স, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা, শিশু ও বৃদ্ধের অনুপাত ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা;

(2) ঐ জনগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র জানা। এর অন্তর্ভুক্ত হল তাদের পেশা ও জীবিকা, তাদের আয়, বসবাসের জায়গার অবস্থা, সামাজিক সুবিধাসমূহ ইত্যাদি।

(3) ঐ জনগোষ্ঠীর কাজকর্ম অর্থাৎ তাদের আচার-আচরণ ও কাজকর্ম যেমন তারা কিভাবে অবসরকালীন সময় কাটায়, তাদের বিনোদন, বেড়ানোর অভ্যাস, ব্যয় করার ধরন, টেলিভিশন দেখা বা রেডিও শোনা, সংবাদপত্র পড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা; এবং

(4) ঐ জনগোষ্ঠীর মতামত ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী জানা। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা, বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা, বাজার গবেষণা ইত্যাদি।

(ঘ) সামাজিক সমীক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical background of social survey) :

সামাজিক সমীক্ষার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। সামাজিক সমীক্ষার প্রারম্ভিক ইতিহাসে যাঁদের নাম জড়িয়ে রয়েছে তাঁরা হলেন **এডেন** (Eden), **মেহিউ** (Mayhew) এবং **বুথ** (Booth)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুথকেই বিজ্ঞানভিত্তিক সামাজিক সমীক্ষার জনক বলা হয়। বুথ 1886 সালে **'শ্রমিক এবং লণ্ডনের অধিবাসীদের জীবন'** নিয়ে একটি সমীক্ষা শুরু করেছিলেন এবং 1902 সালে সমীক্ষার কাজ শেষ করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বুথ (Booth) এবং রোনট্রি (Rowntree) কতকগুলি দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। সেকারণে এঁদের আধুনিক সামাজিক সমীক্ষার পথিকৃৎ বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তী কুড়ি বছরে আরো কিছু ব্যক্তি এধরনের সমীক্ষা চালিয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে **বাওলে** (Bowley) উল্লেখযোগ্য। বিশেষ দশকের শেষ দিকে ও তিরিশের দশকের প্রথম দিকে বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরে পূর্বসূরীদের অনুসৃত পদ্ধতিতে অনেকগুলি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে শহর পরিকল্পনা ও সরকারী কাজকর্মের সাথে সমীক্ষার কাজও যুক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে সামাজিক সমীক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সামাজিক ও সরকারী ক্ষেত্র ছাড়াও কারবারী ক্ষেত্রেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমীক্ষার পদ্ধতির উপর পাঠক্রম তৈরী হয় এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীতে বৃটেনের সাথে সাথে অন্যান্য দেশেও এধরনের সামাজিক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম অবশ্যই করতে হয়। 1967 সালে **গ্লোক** (Glock)-এর সম্পাদনায় 'Survey Research in the Social Sciences' প্রকাশ পায়। এই বইটিতে সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান, শিক্ষা, সোশ্যাল ওয়ার্ক, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমীক্ষার ভূমিকা আলোচনা করা হয়।

সনাতন দারিদ্র্য সমীক্ষা (The Classical Poverty Survey) :

আধুনিক সামাজিক সমীক্ষার পথিকৃৎ **চার্লস বুথ** তাঁর পর্বতপ্রমাণ সমীক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন 1886 সালে এবং 1902 সালে তাঁর সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে শেষ করেন। তাঁর সমীক্ষার

ফলাফল 17টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। **বুথ** ছিলেন একজন ধনী জাহাজ ব্যবসায়ী, শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য এবং জীবন যাত্রার অবস্থা তাঁকে খুবই বিচলিত করেছিল। সমীক্ষা চালানোর ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সমস্যা ছিল লন্ডনে বসবাসকারী বিশাল সংখ্যার শ্রমিকদের সম্বন্ধে তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করা হবে। তিনিই প্রথম তথ্য সংগ্রহের জন্য 'গণ সাক্ষাৎকার' নিয়েছিলেন। লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বুথ পরিবারগুলিকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। এদের মধ্যে চারটি শ্রেণী ছিল **দারিদ্র্য রেখার** উপরে এবং অপর চারটি দারিদ্র্য রেখার নীচে, তবে এই শ্রেণীবিভাগ খুব যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না, কারণ তিনি **'দরিদ্র'** (Poor) ও **'খুব দরিদ্র'** (very poor) সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিখুঁত নয়। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে দারিদ্র্যের ভয়াবহতা ও পরিধি সম্পর্কে এই সমীক্ষা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং রাজনৈতিক ফলও যে পাওয়া গিয়েছিল তা **বিয়াট্রিস ওয়েব** (Beatrice Webb) পরবর্তীকালে দেখিয়েছেন। বস্তুত: বুথের সমীক্ষাই বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষার পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছিল।

বুথের সমীক্ষা শুরুর এক দশক পরে **রোনট্রি** (Rowntree) তাঁর প্রথম সামাজিক সমীক্ষা শুরু করেন 1902 সালে। তাঁর সমীক্ষার বিষয় ছিল 'Poverty : a study of Town Life'। পদ্ধতিগত দিক থেকে তিনটি বিষয়ে তিনি বুথের থেকে আলাদা ছিলেন। এগুলি হল—

প্রথমত: তিনি প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের বাসস্থান, পেশা ও আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন;

দ্বিতীয়ত: তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি পরিবার থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন; এবং

তৃতীয়ত: তাঁর সমীক্ষার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, তিনি দারিদ্র্য সম্পর্কে অনেক নিখুঁত ধারণা দিয়েছিলেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের দারিদ্র্য ও দ্বিতীয় পর্যায়ের দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর মতে পরিবারের মোট আয় যদি পরিবারের সদস্যদের শারীরিক দক্ষতা বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হয় তাহলে তাকে **প্রাথমিক দারিদ্র্য** বলে। অন্যদিকে, পরিবারের আয় যদি পরিবারের সদস্যদের শারীরিক দক্ষতা বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হয় কিন্তু যেহেতু পরিবারকে কিছু প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হয় তাই পরিবারের দারিদ্র্যমোচন ঘটে না। এরূপ অবস্থাকে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের দারিদ্র্য হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি, খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজনের মূল্যও নির্ধারণ করেছিলেন।

প্রায় এক দশক পরে 1912 সালে **বাওলে** (Bowley) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা শুরু করেছিলেন। তিনি পাঁচটি শহরের শ্রমিকদের জীবনযাপনের অবস্থা সমীক্ষা করে 1915 সালে 'Livelihood and Poverty' নামাঙ্কিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন। সামাজিক সমীক্ষার উন্নয়নে **হাওলের** গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল sampling-এর ব্যবহার। পরবর্তীকালে সকল দারিদ্র্য-সমীক্ষাতেই এর ব্যবহার হয়েছিল।

তিরিশের দশকে সমীক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। **ফোর্ড** (Ford) 1932 সালে সাউদাম্পটনে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। এর প্রতিবেদন 1934 সালে **'work and wealth in**

modern port' নামে প্রকাশিত হয়। এই সমীক্ষায় বাউলের পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছিল। তবে ফোর্ড দারিদ্র্যের একটি নতুন ধারণার অবতারণা করেছিলেন। এই নতুন ধারণাটি হল **'সম্ভাব্য দারিদ্র্য'** (Potential poverty)।

অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য সংক্রান্ত সমীক্ষার মধ্যে তিনটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এদের মধ্যে দুটি সমীক্ষা **রোনট্রি** (Rowntree) করেছিলেন। 1935 সালে তিনি **ইয়র্ক** শহরে দ্বিতীয় সমীক্ষাটি চালিয়েছিলেন এবং 1941 সালে 'Poverty and Progress' নামে সমীক্ষার প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমীক্ষায় তিনি আগের 'দারিদ্র্যের প্রমাণ মান' পরিত্যাগ করেছিলেন এবং পরিবর্তে 'মানবিক প্রয়োজন মান' ব্যবহার করেছিলেন। 1950 সালে তিনি ও **লেভার্স** (G.R. Lavers) যৌথভাবে আরো একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এর ফলাফল বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় 1951 সালে। বইয়ের নাম ছিল 'Poverty and the Welfare State'। ইয়র্ক শহরের উপর তৃতীয় সমীক্ষাটি চালিয়েছিলেন **অ্যাবেল-স্মিথ** (Abel-Smith) এবং **টাউনসেন্ড** (Townsend) 1965 সালে। এই সমীক্ষার ফলাফল তাঁরা প্রকাশ করেন "The poor and the poorest" গ্রন্থের মাধ্যমে।

উপরে উল্লিখিত দারিদ্র্যসংক্রান্ত সমীক্ষা ছাড়াও আঞ্চলিক পরিকল্পনা, নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষা সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রেও চালানো হয়েছিল যাদের মধ্যে বাজার গবেষণামূলক ও জনমত সমীক্ষা প্রধান, পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে এই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন সমীক্ষার মধ্যে জনগণনা তথা আদমসুমারিই সর্ববৃহৎ। প্রতিটি দেশে সরকারী উদ্যোগে প্রতি দশ বছর অন্তর এই সমীক্ষা চালানো হয়।

অনুশীলনী :

০১। সামাজিক সমীক্ষা কি? তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

০২। সমীক্ষার বিষয়গুলি কি কি?

০৩। সমীক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

১.২ সামাজিক গবেষণা (Social Research)

(ক) সামাজিক গবেষণা (Social Research) : সাধারণ অর্থে গবেষণা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে নতুন কোন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক গবেষণা বলতে সমাজ-সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের উপর গবেষণাকে বোঝায়। গবেষণা সবসময়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এর হাতিয়ার হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ। প্রকৃত বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণায় সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশী গুরুত্ব পায়, সমাজ বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি বেশী গুরুত্ব পায়। 'প্রকৃতপক্ষে গবেষণা হল বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারের কোন বিষয়কে যাচাই বা পরিমার্জন করার উদ্দেশ্যে ওই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর একটি প্রক্রিয়া।'

1947 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েষ্টার্ন রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কর্মশালার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 'সামাজিক গবেষণা মৌলিক সমাজ বিজ্ঞানের প্রগতির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়'। সামাজিক গবেষণার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ:

1. সামাজিক গবেষণা চালানো হয় সমাজ বিজ্ঞান ও আচরণমূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

2. এরূপ গবেষণা সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়েও চালানো হয়।

3. মানুষের আচরণ সম্বন্ধে পবিষ্কার ধারণা পেতে এবং জ্ঞানের উত্তরণ ঘটানোর লক্ষ্যে অথবা কোনো পুরানো তত্ত্ব বাতিল বা পরিমার্জন করার উদ্দেশ্যে বা নতুন কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এধরনের গবেষণা চালানো হয়।

4. সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেও ব্যবহৃত হয়।

5. সামাজিক গবেষণায় গবেষক তাঁর গবেষণা শুরু করেন শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সমাজ বিজ্ঞানের ফাঁকগুলি ভরাট করার উদ্দেশ্য। এবং এরূপ গবেষণার মূল্য লক্ষ্য হল সামাজিক ঘটনা ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

(খ) সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব (Importance of Research in Social Work) :

সামাজিক কর্ম হল একটি প্রয়োগমূলক পেশা। সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রটি মূলত: উপস্থাপন, উন্নয়ন, মানবিক অসুস্থতার চিকিৎসা এবং সর্বোপরি আশানুরূপ সামাজিক অবস্থার ধনাত্মক প্রসারের সাথে যুক্ত। একারণেই সমাজকর্মীদের বিভিন্ন ধরনের সামজিক সমস্যা ও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ এগুলি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে ব্যক্তি বিশেষ বা দলকে সাহায্য করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল স্থির করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা এখানেই উপলব্ধ হয়। গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা উদ্ভবের পিছনে যে কারণগুলি থাকে সেগুলিকে চিহ্নিত করা যায় এবং সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়। এর দ্বারাই সমাজকর্মীরা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং কখন ও কিভাবে তাদের কাজ শুরু করবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গ্রামে কলেরা মহামারীর আকার নিয়েছে। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য সমাজকর্মীকে প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে যে কলেরা ছড়ানোর পিছনে কি কি কারণ বর্তমান। কোন্ কোন্ জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়াও রোগের ইতিহাস, পানীয় জলের উৎস, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি সম্পর্কেও জানতে হবে। সমস্যার প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়ার পর সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে। কিন্তু যদি সমস্যাটির কেবলমাত্র আপৎকালীন সমাধান করতে চাওয়া হয় তাহলে শুধুমাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেই চলবে। কিন্তু এরূপক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আবার রোগটি ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। কিন্তু যদি এর স্থায়ী সমাধান চাওয়া হয় তাহলে চিকিৎসার সাথে সাথে রোগের কারণগুলিও দূর করতে হবে। অর্থাৎ গবেষণামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে রোগটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে তুলতে পারলে রোগের স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হয়। গবেষণার প্রয়োজন এখানেই। গবেষণার মাধ্যমে সমাজকর্মী রোগ, রোগের কারণ এবং রুগীদের

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পায় এবং সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়।

মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজজীবনও জটিল আকার ধারণ করছে। অতীতের সামাজিক নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে এবং সেগুলি আর সেভাবে কার্যকর হচ্ছে না। এই জটিল সামাজিক পরিবেশকে বুঝতে হলে এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলিকে সমীক্ষা করা প্রয়োজন। সমাজের এই জটিলতা অনুধাবন করার জন্য তাই গবেষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ সমাজকে বা সামাজিক পরিবেশকে বা সামাজিক ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে না জানতে পারলে সমাজকর্মীরা সঠিকভাবে তাদের কাজ করতে পারবে না। সমাজের স্বাভাবিক কার্যকলাপ যখন বিঘ্নিত হয়, সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের তখনই প্রয়োজন হয়। গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক কার্যকলাপ বিঘ্নিত হওয়ার পিছনে কি কারণ রয়েছে তা' খুঁজে বের করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক কর্ম হল যেসব বিষয়গুলি মানুষকে পীড়িত করে সেসব বিষয়ের সমাধান সূত্র বের করা। জটিল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করাও সামাজিক কর্মের উদ্দেশ্যের সাথে খাপ খায় এরূপ বিকল্প সমাধান খুঁজে বের করা। সংক্ষেপে বলা যায় যে এর কাজ হল সমস্যার **প্রতিরোধ,** সোশ্যাল ওয়ার্কের **প্রসার** ও **সমাধান** করা। গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাত্ত্বিকভাবে ও বাস্তবে যাতে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কিত অনুসন্ধান সমাজকর্মীরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, গবেষণা এসব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে সমাজকর্মীদের সাহায্য করে। তবে এটি বাস্তব সত্য যে, সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক রিসার্চ সম্পূর্ণভাবে পৃথক।

(গ) সামাজিক কর্ম গবেষণার বৈশিষ্ট্য (Features of Social work Research) :

সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষণা ও সমাজ বিজ্ঞান মূলক গবেষণার মধ্যে কিছু মিল পাওয়া গেলেও সামাজিক কর্ম গবেষণার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এগুলি হল—

(1) সামাজিক কর্ম গবেষণার উদ্দেশ্য হল সামাজিক কর্ম সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার রীতিবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। এছাড়াও সমাজকর্মীরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেসব সমস্যার বিকল্প অনুসন্ধান করাও এর উদ্দেশ্য।

(2) সামাজিক কর্ম গবেষণা কেবলমাত্র সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয় না। উপরন্তু এই জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ করে সমস্যাপীড়িত মানুষজনকে আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায় সেদিকেও দৃষ্টি দেয়।

(3) সামাজিক গবেষণা ব্যক্তি বিশেষ, গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি সমাজের সমাজিত কার্যকলাপ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

(4) সামাজিক কর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার অংশবিশেষ।

(5) সামাজিক কর্ম গবেষণা সবসময়ই বাস্তবমুখী—মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যার বাস্তব সমাধান কিভাবে সম্ভব তা খুঁজে বের করা ও তা প্রয়োগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। সবশেষে বলা যায় যে সামাজিক কর্ম গবেষণার ব্যক্তিবিশেষ, গোষ্ঠী ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা যেমন এক লক্ষ্য তেমনি বিভিন্ন কৌশলের কার্যকারিতা পরিমাপ করাও এর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) সামাজিক কর্ম গবেষণার পরিধি (Scope of Social Work Research) : সামাজিক কর্ম গবেষণার পরিধি বলতে বোঝায় সামাজিক কর্মের বাস্তব প্রয়োগে যে চতু:সীমার মধ্যে ঘটে। এর ব্যাপ্তি শুরু হয় সামাজিক কর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব গঠন, প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান, নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচী প্রণয়ন, কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ, কর্মসূচীর উপর নিয়ন্ত্রণ ও সর্বোপরি মূল্যায়ন। সামাজিক কর্মের সকল ক্ষেত্রেই যেমন—স্কুল, হাসপাতাল, পরিবার, বয়স্ক ব্যক্তি, যুবসমাজ ইত্যাদি সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষণার প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের কারণে বা মানুষের স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক সমস্যাও ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, এই পরিবর্তন যেহেতু ধারাবাহিক সেকারণে গবেষণাও ধারাবাহিকভাবে চালাতে হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে স্থান, কাল ও সংস্কৃতি ভেদে সামাজিককর্মের প্রয়োগ ভিন্ন হয়। তাই কোনো সমস্যায় সমাধানসূত্র সর্বত্র প্রয়োগ করা যায় না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের দৌলতে মানুষের কর্ম-সংস্কৃতি ও জীবনশৈলীর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেই পরিবর্তন শহরে যতখানি প্রকট গ্রামে ততখানি নয়। তবু, একথাও সত্য যে এই উন্নয়নের ঢেউ গ্রামগুলিকেও আংশিক প্রভাবিত করেছে এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এছাড়াও, নবীন প্রজন্মের ধ্যান-ধারণা, জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, নীতিবোধ ইত্যাদি প্রবীন প্রজন্মের থেকে অনেকটাই পৃথক, সুতরাং বর্তমানে সমাজকর্মীদের কাজের ধারা ও দশ বিশ বছর আগের কাজের ধারা কখনই এক হতে পারে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের কাজের ধারার মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হয়। কাজেই সামাজিক কর্ম গবেষণার ধারাবাহিক প্রয়োজনীয়তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

যেসব ক্ষেত্রে সামাজিক কর্ম গবেষণার ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্প চূড়ান্তকরণ, সামাজিক নীতি নির্ধারণ, সামাজিক আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা মূলক প্রকল্পকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও দু:সময়ে পরস্পরকে সাহায্য করার মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক কর্ম গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক কর্মের প্রধান লক্ষ্য—সামাজিক ন্যায় ও সামাজিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। গবেষণার সুপারিশ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে ফাঁক বা প্রভেদ রয়েছে সেগুলি পূরণ করতে সাহায্য করে।

(ঙ) ভারতে সামাজিক কর্ম গবেষণার অবস্থা (Position of Social Work Research in India) : লক্ষ্যণীয় বিষয় হিসাবে সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সামাজিক কর্মের পাঠক্রম ভারতবর্ষে প্রথম চালু হয় 'Tata Institute of Social Science'-এ। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ-এর উৎপত্তি ঘটে এই প্রতিষ্ঠানেই। তবুও বলা চলে যে ভারতবর্ষে সামাজিক কর্ম গবেষণার অগ্রগতি সেভাবে ঘটেনি। এই ক্ষেত্রের ভারতীয় গবেষকরা, এখনো বিদেশে গবেষণার ফলে গৃহীত পদ্ধতি, কৌশল ও তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে মৌলিকতার অভাব প্রকট। তবে এর অর্থ এই নয় যে বিদেশী গবেষকদের উদ্ভূত তত্ত্ব, পদ্ধতি ও কৌশল ভারতীয় পরিম্ণ্ডলে বাতিল বলে গণ্য হয়। কিন্তু এসব তত্ত্ব, পদ্ধতি ও কৌশলগুলি ভারতীয় পরিমণ্ডলের উপযুক্ত করার জন্য পরিমার্জনের প্রয়োজন,

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গবেষণার ফল এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। এছাড়াও সামাজিক কর্ম পেশা সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষের জ্ঞান খুবই কম। বেসরকারী সংস্থা (NGOs), সরকারী দপ্তর ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি যারা বিভিন্ন স্তরে সামাজিক কর্ম করে তারাও সামাজিক কর্ম সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা চালানোর জন্য গবেষকদের উৎসাহিত করে না। এসব সংস্থা ও সংগঠন যেসব গবেষণা চালায় সেগুলির মধ্যে প্রচুর ভ্রান্তি দেখা যায় কারণ এসব গবেষণার ফল সাধারণ মানুষের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। যদিও বর্তমানে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর চাহিদা বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে তবুও গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন অতি সামান্য। যেসব যোগানমূলক গবেষণা (participatory research) বর্তমানে চালানো হয় সেগুলি মূলত: পরিকল্পিত প্রকল্পগুলি মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। অথচ এধরনের গবেষণা বা সমীক্ষা চালানো উচিত প্রকল্প পরিচালনা চূড়ান্ত করার আগেই। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প চূড়ান্ত করা দরকার। অনেক সময়ই যেসব সংস্থা প্রকল্পের অর্থ সরবরাহ করে তাদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে গবেষণা চালানো হয়, সমাজের মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। খুব অল্প সংখ্যক গবেষণার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মানুষের প্রয়োজন এবং সম্পদের মূল্যায়ন বা কর্মসূচী পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সামাজিক কর্ম গবেষণার ক্ষেত্রে এই ত্রুটির পিছনে যেসব কারণ বর্তমান সেগুলি হল নিম্নরূপ:

1. প্রশাসক ও পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা।

2. গবেষণা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুলতা এবং অর্থ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণার পরিধিকে সংকুচিত করেছে;

3. সামাজিক কর্ম গবেষণার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য উপযুক্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার অভাব;

4. গবেষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকা; এবং

5. সর্বোপরি পেশাজীবি সমাজ কর্মীদের গবেষণার প্রতি অনীহা। অথচ সামাজিক কর্ম গবেষণা ভারতের মতো বৃহৎ দেশে, যেখানে এখনো পর্যন্ত বহু দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে এবং তার ফলে যেসব সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটছে সেগুলির স্থায়ী সমাধানকল্পে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে যেসব ক্ষেত্রে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ চালানোর প্রয়োজন অনুভূত হয় সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

(1) সামাজিক কর্ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষণা : ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা বহু বৈচিত্র্যের অধিকারী। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে সমাজ কর্মের কোন্ পদ্ধতি অধিক কার্যকর হবে তা স্থির করা বাঞ্ছনীয়। ভারতে সমাজ কর্মের ক্ষেত্রে যেসব চিরাচরিত পদ্ধতি যেমন ব্যক্তি কর্ম (case work), গোষ্ঠী কর্ম (group work) এবং সমষ্টি সংগঠন (comy. organisation) তাদের সাফল্যের মূল্যায়ন করা ও প্রতিটি পদ্ধতি কার্য-কারিতা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ভারতের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কাম্য পরিবর্তন এনে সেগুলিকে অধিক কার্যকর করার প্রয়াস চালাতে হবে। আর গবেষণা ছাড়া এসব পদ্ধতির পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন সম্ভব নয়।

(2) কর্মসূচী উন্নয়ন, সংহতিসাধন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে : ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করে। এদের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার জন্য যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা ও মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ তাদের প্রয়োজন ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাপ্ত সম্পদগুলি বিবেচনা করে, কর্মসূচী প্রণয়ন ও কর্মসূচীর উন্নয়ন ঘটনো বাঞ্ছনীয়। গবেষণার মাধ্যমেই সুসংহত কর্মসূচীর প্রণয়ন, উন্নয়ন, বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সংহতিসাধন ও মূল্যায়ন করা সম্ভব।

(3) সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে গবেষণা : কতকগুলি সামাজিক সমস্যা যেমন অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দেহ ব্যবসায় প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমস্যার গভীরতা ও জটিলতা গবেষণার মাধ্যমেই জানা সম্ভব। এগুলি ছাড়াও তফশিলী জাতির, উপজাতির মানুষদের সমস্যা, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সমস্যার সঠিক অনুধাবনের জন্যও গবেষণার প্রয়োজন। এসব সমস্যা ছাড়াও যেসব রোগীর প্রতি, যেমন এড্‌স আক্রান্ত শ্রেণী, বা কুষ্ঠ রোগী বা যক্ষ্মা রোগীর ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজের যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তারও মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সমাধানের উপায় বের করতে হবে। সুতরাং যেকোনো জটিল সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(4) সামাজিক কর্মের ইতিহাস জানা : অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানকে চেনা যায় না। সোশ্যাল ওয়ার্কের ইতিহাস থেকেই এর কাজের ধারা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সোশ্যাল ওয়ার্ককে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা' সমাজকর্মীদের জানা দরকার। সেকারণে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল এর ইতিহাস ও উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা।

(5) সামাজিক কর্ম ও সামাজিক নীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া : সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নীতি অনুসৃত হয়। এই নীতিগুলি বর্তমানে কতখানি কার্যকর অর্থাৎ সামাজিক কর্মের সাফল্য ও ব্যর্থতার পিছনে কতটা ভূমিকা পালন করে তা সমাজকর্মীদের জানা দরকার। আর এ সংক্রান্ত তথ্য কেবলমাত্র সামাজিক কর্ম গবেষণার মাধ্যমেই জানা সম্ভব।

এগুলি ছাড়াও সামাজিক কর্ম গবেষণার প্রয়োজন অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে অনুভূত হয় সেগুলি হল প্রশাসনিক স্তরে, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

(6) সামাজিক কর্মগবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Social Work Research) : রিসার্চ বা গবেষণা অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর দেয়। সেকারণেই গবেষণাকে আধুনিক সভ্যতার পথিকৃৎ আখ্যা দেওয়া হয়। তবে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা যতটা নির্ভুল তথ্য দিতে পারে, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্য অতটা নির্ভুল হতে পারে না। তাই সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এই সীমাবদ্ধতাগুলি নিম্নরূপ:

(1) বেশিরভাগ সামাজিক কর্ম গবেষণাই 'তন্ত্র মতবাদের' (systems approach) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তন্ত্র মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে মানব শরীর থেকে। মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কতকগুলি বিশেষ কাজ সম্পাদন করে। যে কোন একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের কাজে বিঘ্ন হলে তার প্রভাব মানব শরীরের উপর পড়ে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গের কাজের মধ্যে এক ধরনের আন্ত: সম্পর্ক ও পারস্পরিক

নির্ভরতা বর্তমান থাকে। অনুরূপভাবে, যদি গবেষণার ক্ষেত্রে এই মতবাদ অনুসরণ করা হয় তাহলে গবেষণালব্ধ তথ্য এমনভাবে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে যাতে, বর্তমান সামাজিক কাঠামোর সাথে খাপ খাবে। কিন্তু সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন এই কাঠামোর মধ্যেই সমস্যা নিহিত থাকে। এরূপক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়।

(2) সামাজিক কর্ম গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব গবেষণা চালানো হয় সেগুলি সমস্যাকে গভীরভাবে না দেখে কেবলমাত্র উপর থেকে দেখে। এর ফলে সমস্যার জটিল সামাজিক সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ না করে দু-একটি কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয় ও অন্য কারণগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়। এর ফলে সমস্যার একটি আপাত সমাধান হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না।

(3) ভারতে ভূ-প্রাকৃতিক পার্থক্যের কারণে যে আঞ্চলিক বৈষম্য পড়ে উঠেছে তার প্রভাব সামাজিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও পড়েছে। এই কাজকর্ম সঠিকভাবে করতে হলে ধারাবাহিকভাবে গবেষণা চালানো দরকার। কিন্তু তা সম্ভব হয় না কারণ এজন্য যে পরিমাণ শ্রম ও সময় ব্যয় করার প্রয়োজন তা যোগান দেওয়া সহজ নয়। ফলে গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।

(4) যদিও একথা স্বীকার করা যায় না যে সামাজিক কর্মের তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সর্বজনীনতা রয়েছে তবুও একথা সত্য যে এসব তত্ত্ব ও প্রয়োগ-এর মূল নিহিত রয়েছে স্থানীয় ভিত্তিতে। স্থানীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এসব তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন প্রয়োজন, তথাপি অনেক সময়ই এই দিকটির প্রতি গবেষকরা গুরুত্ব দেন না।

(5) বেশিরভাগ গবেষণার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে গবেষক, অর্থ প্রদানকারী সংগঠন, সরকারী বিভাগ ও সমাজকর্মে যুক্ত বেসরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে এক ধরনের ভ্রান্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা কাজ করে। এর ফলে মানুষের প্রয়োজন ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য গৃহীত কর্মসূচী যথাযথ হয় না। সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষকদের পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা গবেষণার ফলকেও পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে এবং গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

(6) ভারতীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্ক কর্মসূচী ও নীতির পিছনে একধরনের রাজনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই রাজনীতি সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষকের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

(7) মানুষ আশা করে যে গবেষণার মাধ্যমে তাদের প্রায় সকল মানবিক সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ধারণা সর্বার্থে ঠিক নয়। তাই সামাজিক কর্ম গবেষণাও সবসময় সফল হয় না ও মানুষের চাহিদা পূরণ করতে বা কাম্য পরিবর্তন আনতে পারে না।

(ছ) সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কর্ম গবেষণার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Social Research and Social work Research)

1937 সালে **হেলেন জেটার** (Helen R. Jetter) তাঁর 'Social work Year Book'-এ বলেছিলেন যে সোশ্যাল রিসার্চ ওয়ার্ক রিসার্চের লক্ষ্য হল সমাজকর্মীরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধানকল্পে এবং সামাজিক কর্মের দর্শন, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, কৌশল ইত্যাদি সংক্রান্ত

বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান। অন্যদিকে স্যোশাল রিসার্চ মৌলিক সমাজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিক নির্দেশ করে। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং পদ্ধতির সামাজিক কর্মের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং এভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত: সোশ্যাল ওয়ার্ক এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ সবসময় সমাজকর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে চালানো হয় অর্থাৎ তার ফলাফল যেন সমাজকর্মীদের কাজের উপযোগী হয়। এদের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা যায়:

পার্থক্যের বিষয়	সামাজিক গবেষণা	সামাজিক কর্ম গবেষণা
১। সংজ্ঞা ঃ	সামাজিক গবেষণা হল মৌলিক সমাজ বিজ্ঞানের উন্নয়ন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান।	সামাজিক কর্ম গবেষণা হল কর্মক্ষেত্রে সমাজ কর্মীরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধান সূত্র সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান।
২। ক্ষেত্র ঃ	সামাজিক গবেষণা সমাজ বিজ্ঞান ও আচরণমূলক বিজ্ঞানের, যেমন— সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়।	এরূপ গবেষণা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও সমাজকর্মীরা কার্যক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধানকল্পে পরিচালিত হয়।
৩। লক্ষ্য ঃ	সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক সমস্যা, মানুষের আচরণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা এবং পুরানো কোন তত্ত্ব বাতিল বা সংশোধন বা পরিমার্জন করার লক্ষ্যে এরূপ গবেষণা চালানো হয়। সংক্ষেপে, সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে কি ধরনের গবেষণা চালানো হয়।	বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মূল কারণ অনুধাবন করা, কর্মক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলি দূর করার উপায় বের করা এবং বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচীর কার্যকারিতা যাচাই করা এরূপ গবেষণার লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে।
৪। পরিধি ঃ	সামাজিক গবেষণার পরিধি অনেক বিস্তৃত। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ই এরূপ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়।	সমাজ কর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার অংশবিশেষ। সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ-মূলক কাজের পরিধির অন্তর্ভুক্ত বলে একে সামাজিক গবেষণার গণ্ডির মধ্যেই কাজ করতে হয়। সুতরাং তুলনামূলকভাবে এর পরিধি সংকীর্ণ।
৫। ভিত্তি ঃ	সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে যেসব ফাঁক দেখা যায় সেগুলিকে ভিত্তি করেই সামাজিক গবেষণা শুরু হয়। নতুন জ্ঞানের অন্বেষণই হল এর মূল ভিত্তি।	সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ-এর ভিত্তি হল মানুষের প্রয়োজন ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সমস্যা।

(জ) সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between the survey and the Research) : সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে কিছু মিল থাকলেও এদের কোনভাবেই সমার্থক বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সমীক্ষা হল কোনো বিষয় সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা বা অনুসন্ধান করা যাতে ঐ বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা যায়। সাধারণত: কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা রূপায়ণের আগে বাস্তব অবস্থা যাচাই করার জন্য যে অনুসন্ধান চালানো হয় তাকেই বলে সমীক্ষা। অন্যদিকে কোন মৌলিক বিষয়ে যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে অনুসন্ধান চালানো হয় এবং যার উদ্দেশ্য হল নতুন কোন জ্ঞানের উদ্ভাবন বা প্রচলিত তত্ত্বের বিয়োজন বা পরিমার্জন বা সংশোধন তখন তাকে গবেষণা বলে। কোন বিষয়ে সমীক্ষা যখন খুব গভীরভাবে (in depth) চালানো হয় তখন তা গবেষণা বলে গণ্য হতে পারে।

সমীক্ষা মূলত: সমস্যাভিত্তিক। কোনো সমস্যার কারণ, গভীরতা, ব্যাপকতা ইত্যাদি নির্ধারণ করার জন্য সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে ওই সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ও কার্যসূচী প্রণয়ন করা হয়। অন্যদিকে গবেষণার মাধ্যমে সমস্যার মূল কারণ যেমন জানা যায়, সাথে সাথে ঐ সমস্যা সমাধানের স্থায়ী সূত্রও আবিষ্কার করা হয়। সমীক্ষায় যেখানে সমস্যা বা ঘটনার বিবরণ গুরুত্ব পায় গবেষণায় ঐ সমস্যা বা ঘটনার নতুন দিক উন্মোচন করা হয়। তাই সমীক্ষার ফলাফল স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু গবেষণার ফল দীর্ঘস্থায়ী। সমীক্ষার ফলাফল স্থান, কাল ও পরিবেশ ভেদে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ নমনীয়, কিন্তু গবেষণার ফলাফল নমনীয় নয়। এর মধ্যে সর্বজনীনতা দেখা যায়।

গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষত: বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার (experiments), সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু সমীক্ষায় এধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। নিরীক্ষা প্রধানত: বিবরণমূলক (descriptive) এবং কখনো কখনো উদ্দেশ্যমূলক। অন্যদিকে গবেষণা প্রধানত: আদর্শজ্ঞাপক (normative)। তবে কার্যক্ষেত্রে অনেক সময়ই সমীক্ষা বোঝাতে গবেষণা শব্দটিও ব্যবহৃত হয়, যেমন— বাজার গবেষণা, জনমত সংক্রান্ত গবেষণা ইত্যাদি। এগুলি প্রকৃতপক্ষে বাজার সমীক্ষা, মতামত সমীক্ষাকে বোঝায়।

অনুশীলনী :

০১। সামাজিক গবেষণার অর্থ কি? তার উদ্দেশ্য ও পরিধি বিশ্লেষণ করুন।

০২। সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি?

০৩। সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কর্ম গবেষণার পার্থক্যসমূহ উদাহরণযোগে ব্যাখ্যা করুন।

১.৩ সামাজিক কর্মগবেষণাগার প্রক্রিয়া (Process of Social Work Research)

ধারণা : গবেষণা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কতকগুলি বিশেষ কাজ সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। আর এই কাজগুলি অনেকটা সিঁড়ির ধাপের মত অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই কাজগুলি

সম্পাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। আবার গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বিপরীতক্রমে সেগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একে অপরের উপর নির্ভরশীল। গবেষণার ক্ষেত্রে এই কাজগুলি বা পদক্ষেপগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয় বলেই এদের গবেষণার পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়। গবেষণার প্রধান ধাপগুলি হল নিম্নরূপ:

1. গবেষণার সমস্যাকে চিহ্নিত করা।

2. (ক) বিভিন্ন ধারণা ও তত্ত্বের পর্যালোচনা; এবং

(খ) অনুরূপ ক্ষেত্রে গবেষণা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

3. প্রকল্প রচনা করা।

4. গবেষণার নক্সা অর্থাৎ পরিকল্পনা স্থির করা।

5. উপাত্ত (data) বা তথ্য সংগ্রহ।

6. সংগৃহীত উপাত্ত বা তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকল্প পরীক্ষা।

7. উপাত্ত বা তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রতিবেদন তৈরী।

তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে এই ধাপগুলির পরিবর্তন করা যায়। সামাজিক কর্ম গবেষণার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ধাপগুলি অনুসৃত হয়। তবে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ যেহেতু সমাজকর্মীরা কাজের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে সেকারণে এধরনের গবেষণায় কোন বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। তাই **সমস্যা চিহ্নিতকরণ** যেমন এরূপ গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ বলে গণ্য হয় তেমনি সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরি এর শেষ পর্যায়ের কাজ হিসাবে গণ্য হয়। অবশ্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের কাজই গবেষণার এই দুই পর্যায়ের কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং এই পর্যায়ের কাজ জটিল প্রকৃতির ও গবেষণার মূল কাজ হিসাবে স্বীকৃত হয়। এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে গবেষণার পরিকল্পনা বা নক্সা ইত্যাদি যেমন থাকে তেমনি গবেষণার হাতিয়ার তৈরি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উৎস স্থির করা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা, সেগুলি বাছাই করা, প্রকল্প তৈরি, প্রকল্প পরীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি থাকে।

(খ) গবেষণা : সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of Research Problem) :

গবেষণার সমস্যা বলতে বোঝায় গবেষণার মাধ্যমে যেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়। সুতরাং গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ বলতে বোঝায় গবেষকরা কোন্ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার জন্য গবেষণা চালাবে অর্থাৎ গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় কি হবে তা স্থির করা। সমস্যাকে ভালভাবে বোঝার জন্য গবেষকদের সমস্যার তত্ত্বগত দিক ও বাস্তব দিক পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এজন্য সমস্যাসংক্রান্ত যেসব বইপত্র রয়েছে সেগুলি যেমন পড়তে হবে, তেমনি যেসব ব্যক্তি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাদের সাথে

এবং সমস্যা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের সাথেও আলোচনা করতে হবে। এভাবে সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা হলে গবেষণার পদ্ধতি-প্রকরণ স্থির করতে হবে। সুতরাং সমস্যা চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রেও একাধিক কাজ করার প্রয়োজন হয়। গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে যেসব সুফল পাওয়া যায়। সেগুলি হল—

1. এর দ্বারা গবেষণার বিষয়বস্তুর চতু:সীমা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়;
2. এর ফলে গবেষণার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হয় এবং গবেষণা চালানো সহজ হয়;
3. সমস্যাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়; এবং
4. গবেষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্কহীন তথ্য ও উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়।

গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ বলতে মূলত: বোঝায় গবেষণার বিষয় স্থির করা অর্থাৎ কোন্ বিষয়ের উপর গবেষণা চালানো হবে। বিষয়টি মূলত: নির্ভর করে গবেষকের ইচ্ছা ও কোন্ বিষয়ের উপর তার ব্যুৎপত্তি রয়েছে তার উপর। তাই যেকোনো গবেষকেরই প্রথম কাজ হল তার গবেষণার ক্ষেত্রটি স্থির করা। কারণ গবেষণার বিষয় ও গবেষণার ক্ষেত্রটি সুনির্দিষ্ট করতে না পারলে গবেষণার লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয় না। এজন্য তার করণীয় বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ:

1. গবেষণার যে ক্ষেত্রে গবেষকের ব্যুৎপত্তি রয়েছে বা সমাজ কর্মীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তাদের মধ্যে যে সমস্যাটি তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সেই সমস্যা বা বিষয়কেই গবেষণার বিষয় হিসাবে স্থির করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন গবেষক 'নেশার দ্রব্য অপব্যবহার' সম্পর্কে গবেষণা করতে চায়। এক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রটি অনেক বড় কারণ নেশাকর দ্রব্যের অপব্যবহারের মধ্যে সিগারেট, মদ, গাঁজা, বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ ইত্যাদি রয়েছে। সুতরাং তাকে ঠিক করে নিতে হবে যে সে কোন্ বিশেষ দ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণা চালাতে চায়। অর্থাৎ সে ধূমপায়ীদের মধ্যে বা মদে আসক্ত বা বিভিন্ন নেশার ঔষধ গ্রহণে আসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যেকোন একটি বিষয় তার গবেষণার জন্য গ্রহণ করতে পারে।

2. গবেষণার নির্দিষ্ট সমস্যা বা বিষয়টিকে নির্বাচন করা হলে সমস্যা বা বিষয়টিকে আরো সঙ্কুচিত করা বাঞ্ছনীয়। কারণ মূল সমস্যাটিকে গবেষণার বিষয় হিসাবে যেমন গ্রহণ করা যায় তেমনি ঐ বিষয়ের যেকোনো একটি বা দুটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা যায়। যেমন, মদে আসক্ত ব্যক্তিদের উপর গবেষণা চালানো স্থির করা হলে বিষয়টিকে আরো সঙ্কুচিত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মদে আসক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা বা ঐ ব্যক্তি যেসব সামাজিক সমস্যা তৈরী করে তাদের প্রকৃতি ও সমাজের উপর প্রভাব বা পরিবারের দুর্দশার পিছনে এধরনের নেশার ভূমিকা কতটা ইত্যাদি গবেষণার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

3. এরপর গবেষককে তার গবেষণার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য স্থির করতে হবে। কারণ উদ্দেশ্য গবেষককে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তার গবেষণা চালানোর জন্য পথ দেখায়। এর ফলে গবেষক তার গবেষণার বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারে না।

উপরের পদক্ষেপগুলি ছাড়াও গবেষণাকালীন গবেষককে কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়। এগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) গবেষক অবশ্যই তার সহযোগী এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রয়েছে এরূপ ব্যক্তিদের সাথে অবশ্যই আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করবে। এর ফলে গবেষণার ক্ষেত্রকে আরো সুনির্দিষ্ট ও সংকুচিত করা যেমন সম্ভব হবে তেমনি গবেষণার কার্যগত দিকটি স্থির করাও সহজ হবে।

(ii) গবেষণার বিষয়সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তক খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। এর ফলে ঐ বিষয়ের উপর গবেষকের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটবে।

(iii) গবেষণার বিষয়ের উপর গবেষকের আকর্ষণ থাকতে হবে এবং অনুরূপক্ষেত্রে যেসব গবেষণা চালানো হয়েছে সেগুলির উপরও তার ধারণা থাকতে হবে।

(iv) গবেষণার যেসব বিষয়ের ব্যাপ্তি বিশাল অথচ সহজেই গবেষককে আকর্ষণ করে সেসব বিষয় এড়িয়ে চলাই যথোচিত কাজ বলে মনে করা হয়।

(v) সর্বোপরি গবেষণার সমস্যা বা বিষয়টিকে অবশ্যই সময়, শ্রম ও অর্থের নিরিখে সম্পাদনযোগ্য হতে হবে।

(গ) গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ (Review of Literature) :

গবেষণার সমস্যা বা বিষয় স্থির করা হলে গবেষকের দ্বিতীয় কাজ হল ঐ বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আহরণ করা। অর্থাৎ সমস্যার প্রকৃতি, কারণ গভীরতা এসব বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকলে গবেষণা সঠিক পথে চালানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন পুস্তক পাঠের মাধ্যমে গবেষণা করা বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে পারে। এর ফলে গবেষণা নকল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন থাকে না তেমনি গবেষণার সঠিক দিক নির্দেশও পাওয়া যায়। এছাড়াও গবেষণাকালীন কি ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিতে পারে তা সে ব্যাপারেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুস্তক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়নেও সাহায্য করা সম্ভব হয়। পুস্তক পর্যবেক্ষণ বলতে কেবলমাত্র প্রকাশিত পুস্তকেই বোঝায় না অপ্রকাশিত পুস্তক বিভিন্ন জার্নাল বা সাময়িক পত্রিকা সরকারি প্রতিবেদন, আলোচনা সভার পর্যায়করণ ইত্যাদিকেও বোঝায়, সেগুলি থেকে গবেষণার উপযোগী বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এগুলি কেবলমাত্র পড়লেই হবে না সেগুলির একটি তালিকাও তৈরি করতে হবে। কারণ গবেষণায় সাহায্যকারী পুস্তক ও যে-উৎস থেকে গবেষণা সম্পর্কিত কোন বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে সেগুলি পুস্তকসূচীতে উল্লেখ করা দরকার।

অনুশীলনী :

০১। গবেষণার প্রধান ধাপগুলি কি?

০২। গবেষণার সমস্যা নির্ণয় কেন প্রয়োজন এবং কিভাবে তা করা হয়।

১.৪ প্রকল্প বিধিবদ্ধকরণ (Formation of Hypothesis)

(ক) ধারণা : প্রকল্প বলতে বোঝায় এক বা একাধিক সংকল্প বা প্রস্তাব যা কোন বিষয় বা বস্তু ঘটার পিছনে ব্যাখ্যা হিসাবে দেওয়া হয়। এটি একটি সাধারণ ও সাময়িক অনুমান হতে পারে যা সমীক্ষার দিক নির্দেশ করে অথবা প্রতিষ্ঠিত সত্যের নিরিখে কোন সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। যখন প্রতিষ্ঠিত সত্যের নিরিখে কোন প্রকল্প স্থির করা হয় তখন সাধারণত: প্রকল্পের বৈধতা যাচাই করা হয়। বেশিরভাগ সময়েই একটি গবেষণামূলক প্রকল্প হল ভবিষ্যৎ অনুমান সূচক বক্তব্য যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা যায়। অর্থাৎ পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্বাধীন চলকগুলি ও নির্ভরশীল চলকগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে দেখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যেসব স্কুল-কলেজে ছাত্রদের বৃত্তিমূলক পরামর্শ দেওয়া হয় সেসব ছাত্ররা কর্মজগতে বিশেষ সাফল্য পায় এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশী হয়। এখানে স্বাধীন চলকটি হল বৃত্তিমূলক 'পরামর্শ' এবং নির্ভরশীল চলকটি হল কর্মজগতে তাদের 'উৎপাদনশীলতা'।

ওয়েবস্টার অভিধান প্রকল্পের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাহল 'এটি একটি প্রস্তাব, অবস্থা অথবা নীতি, যা সম্ভবত: বিশ্বাস ছাড়াই অনুমান করে নেওয়া হয়, যার উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিস্থাপন করা এবং প্রকল্পের বক্তব্যের সাথে সত্যের যোগসূত্র পরীক্ষা করা যা' গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় বা স্থির করা যায়।'

একটি প্রকল্প খুবই উপযোগী বলে গণ্য হয় যদি সেটি সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তবে গবেষণার ক্ষেত্রে যদিও প্রকল্প অত্যন্ত উপযোগী বলে গণ্য হয় কিন্তু সব গবেষণার ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আবিষ্কারমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন কোন সমস্যামূলক গবেষণা চালানো হয় তখন এক বা একাধিক প্রকল্প প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরূপ গবেষণার ক্ষেত্রে এক বা একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করতে হয়, যেগুলি সমস্যার কারণগুলিকে চিহ্নিত করে বা অনুসন্ধানের অন্তর্গত দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে 'সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রকল্প সাধারণভাবে দু'ধরনের—নিষ্ফল বা বাতিল প্রকল্প (null hypothesis) এবং পরিবর্ত প্রকল্প (alternate hypothesis)। নিষ্ফল বা বাতিল প্রকল্পকে H_0 ও পরিবর্ত প্রকল্পকে H_1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। নিষ্ফল প্রকল্প তৈরি করা হয় পরিবর্ত প্রকল্পকে পরীক্ষা করার জন্য। পরিবর্ত প্রকল্প যা বলে নিষ্ফল প্রকল্প তার বিপরীত বক্তব্য রাখে। তাই নিষ্ফল প্রকল্পটি যদি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অসমর্থিত বা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে পরিবর্ত প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

(খ) উপযোগিতা : গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্পের **উপযোগিতা** কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এর উপযোগিতা নিম্নোক্ত কারণে উপযোগী বলে গণ্য হয়:

1. প্রকল্প গবেষণাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।
2. প্রকল্প গবেষক সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে অর্থাৎ কিভাবে গবেষণার কাজ করা হবে,

কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কিভাবে প্রাপ্ত তথ্যগুলি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হবে সেব্যাপারে সাহায্য করে।

3. প্রকল্প গবেষককে যেমন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে তেমনি গবেষণার কাজের মধ্যে পরিচ্ছন্নতাও প্রদান করে।

4. এগুলি ছাড়াও প্রকল্প গবেষককে তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে সে ব্যাপারেও সাহায্য করে।

(গ) প্রকল্প পরীক্ষা (Test of Hypothesis) :

প্রকল্প পরীক্ষা গবেষণার মৌলিক কাজগুলির অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প প্রণয়ন করার পর প্রকল্পের বৈধতা পরীক্ষা করতে হয়। এই পরীক্ষা কতকগুলি ধাপে সম্পন্ন হয়। এই ধাপগুলি হল—

(1) প্রকল্প প্রণয়ন বা বিধিবদ্ধকরণ (Formulation of a hypothesis) : প্রকল্প প্রণয়ন বা বিধিবদ্ধকরণ হল গবেষণার ভিত্তি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গবেষণার ক্ষেত্রে দু' ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়—নিষ্ফল বা **বাতিলযোগ্য প্রকল্প** (null hypotheis) এবং **পরিবর্ত প্রকল্প** (alternate hypothesis)। উভয় ধরনের প্রকল্প সাধারণত: কিরূপ হয় তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হল।

ধরা যাক একটি ঔষধ কোম্পানী বাজারে একটি নতুন ঔষধ উপস্থাপন করতে চাইছে। কিছু রুগীর উপর ঔষধের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ঔষধটি বাজারে উপস্থাপন করা হবে কি হবে না। প্রকল্প পরীক্ষার জন্য প্রথমেই পরীক্ষার বিস্তৃতি (parameter) অনুমান করতে হবে এবং এই অনুমানই হল প্রকল্প।

প্রথমেই একটি বাতিলযোগ্য বা নিষ্ফল প্রকল্প নিয়ে শুরু করতে হবে এবং ধরা যাক্ প্রকল্পটি হল: H_0 ; P = 100. এই প্রকল্পে P হল যতজন রুগীর উপর ঔষধের প্রতিক্রিয়া দেখা হবে অর্থাৎ পরীক্ষার বিস্তার (Population parameter)।

এবার এটি পরিবর্ত প্রকল্পের 'সাপেক্ষে পরীক্ষা করতে হবে এবং পরিবর্ত প্রকল্পটি হল H_1 : P $\neq$ 100।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিষ্ফল বা বাতিলযোগ্য প্রকল্পটি পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য না বাতিলযোগ্য তা স্থির করতে হবে। যদি নিষ্ফল প্রকল্পটি বাতিল হয় তাহলে পরিবর্ত প্রকল্পটি গৃহীত হয় এবং বিপরীতক্রমে যদি নিষ্ফল প্রকল্পটি গৃহীত হয় তাহলে পরিবর্ত প্রকল্পটি বাতিল বলে গণ্য হয়।

(2) একটি উপযোগী তাৎপর্যের স্তর স্থির করা (Setting up a suitable significance level) :

নিষ্ফল বা বাতিলযোগ্য প্রকল্পটি গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে দু' ধরনের ত্রুটি বা ভ্রান্তি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলি হল—

(i) প্রথম ধরনের ত্রুটি (Type 1 error) : যখন নিষ্ফল প্রকল্পটিকে বাতিল করা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি সঠিক; এবং

(ii) দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটি (Type II error) : যখন নিষ্ফল প্রকল্পটিকে গ্রহণ করা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি সঠিক নয়।

তাৎপর্যের স্তর বলতে বোঝায় প্রকল্প পরীক্ষার প্রথম প্রকার ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা। সাধারণত: এর মান 5% ধরে নেওয়া হয় (অর্থাৎ a = ·05)। এর অর্থ হল প্রকল্প পরীক্ষার পর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেখানেও ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অবশ্য কখনো কখনো a-র মান 1% (a = ·01) নেওয়া হয়। তবে তা নির্ভর করে অনুসন্ধানকারীর পছন্দের উপর এবং গবেষণার বিষয়ের সংবেদনশীলতার উপর।

(ঘ) উপযুক্ত পরীক্ষার মান স্থির করা (Determining appropriate test criterion) :

গবেষণার জন্য যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলির বৈধতা নিরূপণ করার জন্য একটি উপযুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি বা পরীক্ষার মান স্থির করতে হয়। সাধারণত: সংগৃহীত তথ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই পরীক্ষা পদ্ধতি স্থির করা হয়। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হল—

(i) নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন—যেক্ষেত্রে স্যাম্পেল বা নমুনার সংখ্যা 30 বেশী হয় সেক্ষেত্রে এই পরীক্ষা পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী।

(ii) t-ডিস্ট্রিবিউশন—নমুনা বা স্যাম্পেলের সংখ্যা কম হলে সেখানে t-tests করা হয়।

(iii) এছাড়াও F-Test ও Chi-square test ব্যবহৃত হয়।

(4) সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision making) :

উপযুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলির গড় (mean) বের করা হয় এবং নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলের ফলের সাথে তুলনা করা হয়। যদি পরীক্ষালব্ধ ফল নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে উল্লিখিত ফলের চেয়ে বেশী হয় তাহলে নিষ্ফল প্রকল্পটি (null hypothesis) বাতিল বলে গণ্য হয় ও পরিবর্ত প্রকল্পটি গৃহীত হয়। বিপরীতক্রমে নিষ্ফল প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

(চ) একটি ভাল প্রকল্পের গুণাবলী (Characteristics of a good hypothesis) :

গবেষণার ক্ষেত্রে গৃহীত একটি প্রকল্পের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বাঞ্ছনীয়:

1. প্রকল্পটিকে সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট এবং সহজ ভাষায় সরল বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

2. প্রকল্পটি এমন হবে যাতে সেটিকে পরীক্ষা করা যায়।

3. সম্পর্কভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যেন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত চলকগুলির (variables) মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে।

4. প্রকল্পের পরিধি (scope) খুব ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এর পরিধি যত সীমিত হয় প্রকল্পটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ততটাই সুবিধা হয়।

5. প্রকল্পটি যথাসম্ভব সহজভাষায় প্রকাশ করা উচিত যাতে সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রকল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করতে পারে।

6. প্রকল্পটি যেন জ্ঞাত বা গৃহীত ঘটনার নামে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

7. একটি ভাল প্রকল্প সবসময়ই যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষার (testing) উপযোগী হয়।

অনুশীলনী :

০১। প্রকল্প বিধিবদ্ধকরণের অর্থ কি এবং এর উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

০২। একটি ভাল প্রকল্পের গুণাবলীগুলির উল্লেখ করুন।

১.৫ গবেষণার নক্শা বা রূপরেখা (Research Design)

(ক) অর্থ : গবেষণার নক্শা হল 'গবেষণা সংক্রান্ত সার্বিক পরিকল্পনা ও কৌশল যার মাধ্যমে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় বা গবেষণার প্রকল্পটি পরীক্ষা করা যায়।' এটি হল গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত শর্তগুলির বিন্যাস— যাতে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। গবেষণার নক্শা বা রূপরেখা কিভাবে ও কখন কোন্ কাজটি করতে হবে তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে গবেষণার দিক নির্দেশের কাজটি সম্পন্ন হয়। গবেষণার নক্শা বা রূপরেখা গবেষণাকে উদ্দেশ্যমুখী করে ও সঠিকপথে চলতে সাহায্য করে। এর দ্বারা অহেতুক অনুসন্ধান চালানো সম্ভাবনা যেমন কমে তেমনি গবেষণায় সাফল্য পাওয়ার বিষয়টি অনেকাংশে সুনিশ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি হল গবেষণার ধারণামূলক কাঠামো যার মধ্যে গবেষণা পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে সম্ভাব্য গবেষণার এটি হল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা ভবিষ্যৎ রূপরেখা। এই নক্শা বা রূপরেখা গবেষণার ধরন ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একথা বলা যায় যে গবেষণার ধরন বা উদ্দেশ্য বিভিন্ন হলে গবেষণার নক্শাও বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রেই একটি উপযুক্ত ও কার্যকরী গবেষণার নক্শা তৈরি করতে হয়। গবেষণার এমন কোন নির্দিষ্ট নক্শা নেই যা' সব ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রেই অনুসৃত হতে পারে। তবে একথা ঠিক যে নক্শার কাঠামোটি কম-বেশী একইরূপ হয়।

(খ) গবেষণার নক্শার উপাদানসমূহ (Components of a Research Design)

গবেষণার নক্শা বলতে বোঝায় গবেষণা চালানোর জন্য গবেষক গবেষণার প্রাথমিক স্তরে যে রূপরেখা তৈরী করে। এটি হল গবেষণা কিভাবে পরিচালিত হবে সে সংক্রান্ত আগম পরিকল্পনা। এটি সবসময়ই উদ্দেশ্যমুখী এবং সংগঠিতভাবে গবেষণার কাজগুলি সম্পন্ন করার রূপরেখা। গবেষণার নক্শা তৈরীর আগে গবেষককে কতকগুলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং তারপর গবেষণার নকশা চূড়ান্ত করতে হয়। এই সিদ্ধান্তের বিষয়গুলি হল—

(i) গবেষণার বিষয় সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু কি? প্রকৃতপক্ষে, ভূমিকায় এই বিষয়ের পরিষ্কার উল্লেখ থাকে।

(ii) গবেষণার কারণ সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ গবেষণা কেন চালানো হবে?

(iii) গবেষণার স্থান সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ গবেষণা কোথায় চালানো হবে?

(iv) তথ্য ও উপাত্ত সংক্রান্ত—অর্থাৎ গবেষণায় কি ধরনের তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে?

(v) তথ্য ও উপাত্তের উৎস সংক্রান্ত—অর্থাৎ গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে?

(vi) গবেষণার সময় সংক্রান্ত—অর্থাৎ গবেষণা চালানোর জন্য কতটা সময় পাওয়া যাবে বা গবেষণার সময়সীমা কি?

(vii) গবেষণার স্যাম্পেল বা নমুনা সংক্রান্ত—অর্থাৎ গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত যে উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে তার পরিধি কিরূপ?

(viii) তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বিষয়ক—অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কোন্ পদ্ধতি সর্বাধিক উপযোগী বলে বিবেচিত হবে এবং গ্রহণ করা হবে?

(ix) তথ্য বিশ্লেষণ বিষয়ক—সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণের জন্য কোন্ পদ্ধতি সর্বাধিক উপযোগী হবে এবং গ্রহণ করা হবে?

(x) প্রতিবেদন সংক্রান্ত—সবশেষে গবেষণার প্রতিবেদনটির লিখনশৈলী অর্থাৎ কিভাবে গবেষণার প্রতিবেদন লেখা হবে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে।

উপরের প্রশ্নগুলির উপর গবেষণার নক্শার চূড়ান্তকরণ নির্ভর করে। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে গবেষক তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলে গবেষণার রূপরেখা বা নক্শা তৈরী করা সম্ভব হয়। এরূপ নক্শার বিভিন্ন অংশ বা অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি সাধারণত: নিম্নরূপ হয়:

(1) সমস্যা : গবেষণার নক্শায় গবেষণার প্রধান সমস্যা বা বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত ও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(2) গবেষণার প্রকৃতি : গবেষণার প্রকৃতি কিরূপ অর্থাৎ গবেষণাটি পরীক্ষমূলক, না বিবরণমূলক, না তত্ত্বমূলক না অন্য ধরনের তা গবেষণার নক্শায় বিবৃত করতে হবে।

(3) উদ্দেশ্য : গবেষণার উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কারভাবে নক্শায় উল্লেখ থাকবে। যেক্ষেত্রে গবেষণার একাধিক উদ্দেশ্য থাকে সেক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি অবশ্যই স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার। তবে সাধারণ নিয়মানুযায়ী উদ্দেশ্যের সংখ্যা **ছয়ের** বেশী হওয়া বাঞ্ছণীয় নয়।

(4) মূল ধারণা : গবেষণার বিষয় বা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষক যেসব ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করে অনুসন্ধান কাজে অগ্রসর হতে চান সেগুলির কার্যগত ব্যাখ্যা নক্শার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(5) গবেষণার পরিধি : গবেষণার রূপরেখা বা নক্শার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল গবেষণার পরিধি সংক্রান্ত বিষয়টি। গবেষণার তাৎপর্য ও সঙ্গতি সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য নক্শায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ গবেষণা কেন চালানো হচ্ছে? বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারকে এই গবেষণা কতখানি সমৃদ্ধ করবে? গবেষণা কোন্ উদ্দেশ্য পূরণ করতে সমর্থ হবে ইত্যাদি। এর সাথে তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত পরিধিরও উল্লেখ থাকে, যেমন তথ্য সংগ্রহের উৎসের আকার ও আয়তন, নমুনার আকার ও আয়তন ইত্যাদি।

(6) তথ্য সংগ্রহ : গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল তথ্য ও উপাত্ত (data) সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তগ্রহণ। গবেষণার নক্শায় এ সংক্রান্ত বিশদ্ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। গবেষণার নক্শার এ সংক্রান্ত উপাদানগুলি হল—

(a) তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের উৎস সংক্রান্ত বিবরণ;

(b) তথ্য সংগ্রহে যেসব পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয় সেগুলির বিবরণ; এবং

(c) যে অবস্থায় তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার বিবরণ,—যেমন বাড়ি বাড়ি গিয়ে না একজায়গায় বসে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, সকালে না সন্ধ্যায় তথ্য সংগ্রহের কাজ চালানো হবে, প্রাথমিক তথ্য ও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি।

(7) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বিশ্লেষণ : সবশেষে সংগৃহীত তথ্য কিভাবে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হবে তার উল্লেখ গবেষণা নক্শায় থাকে। অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যের ঝাড়াই-বাছাই, সুসংবদ্ধকরণ, সম্পাদনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কিভাবে করা হবে নক্শায় তার উল্লেখ থাকে।

অনুশীলনী :

০১। গবেষণার রূপরেখার অর্থ ও তার উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

১.৬ নমুনাকরণ বা নমুনাচয়ন বা স্যাম্পলিং (Sampling)

(ক) ধারণা ও গুরুত্ব : গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনাকরণ বা স্যাম্পলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তথ্য সংগ্রহের সমস্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক উৎস নির্বাচন করে সেই উৎসগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। উৎসের সংখ্যা যখন খুব বেশী হয় বা উৎসের পরিধি যখন ব্যাপক হয় তখন দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়। সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে কথায় 'জনগোষ্ঠী' বা population বলা হয়। এই জনগোষ্ঠী বা population থেকে সবসময় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কারণ এর ফলে যে পরিমাণ শ্রম, সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয় তা গবেষকের পক্ষে যোগান দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে বিশাল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলির বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করাও জটিল হয়ে পড়ে। তাই সাধারণত: জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি মূলক একটি ছোট জনগোষ্ঠী নির্বাচন করা হয় এবং এদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই বলে নমুনাকরণ বা sampling.

উদাহরণ স্বরূপ, কোলকাতার রাজবাগান বস্তিতে বসবাসকারী পরিবারগুলির আর্থসামাজিক অবস্থা নিরূপণের উদ্দেশ্যে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা চালানো হবে। ধরা যাক্, ঐ বস্তিতে 10,000টি পরিবার বসবাস করে। তাহলে এখানে তথ্য সংগ্রহের জনগোষ্ঠী বা population হল 1,000। কিন্তু এই 1,000টি পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, ব্যায়সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই গবেষক তার কাজের বোঝা যাতে কম হয় সেজন্য ওই 1,000টি পরিবার থেকে প্রতি 10টি পরিবার পিছু 1টি পরিবার নির্বাচন করে অর্থাৎ বস্তির মোট 100টি পরিবার বেছে নেয় এবং ঐ 100টি পরিবার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। 1000টি পরিবার থেকে এই 100টি পরিবার বেছে নেওয়ার পদ্ধতিটিকেই sampling বা নমুনাকরণ বলা হয়। অবশ্য এই 100টি পরিবার গবেষকের খুশি বা ইচ্ছামত বেছে নেওয়া যায় না। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই বাছাইয়ের কাজ করতে হয় যাতে নির্বাচিত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নমুনা বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ population-কে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। অন্যথায় গবেষণার ফল ফলপ্রসূ হয় না।

নমুনাকরণ বা sampling গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় পদ্ধতি। এর ফলে গবেষণার কাজ অনেক হাল্কা হয় ও কম সময়ে ও দ্রুততার সাথে গবেষণা চালানো সম্ভব হয়। এর যেমন কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রয়েছে তেমনি এর অসুবিধাও রয়েছে। কারণ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বা sample যদি বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ Population-এর প্রকৃত ও যথাযথ প্রতিনিধিত্বমূলক না হয় তাহলে গবেষণার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একারণে sample নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় এবং কতকগুলি বিশেষ পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি (special statistical techniques) ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিগুলিকে sampling techniques বলা হয়।

সুতরাং নমুনাকরণ বা sampling-এর সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে 'তথ্যের সমগ্র উৎসের একটি অংশ এমনভাবে নির্বাচন করা যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র উৎস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য করা সম্ভব হয়।' সেজন্য এই পদ্ধতিতে সমগ্র জনগোষ্ঠী বা উৎসের (population) একটি অংশের উপর সমীক্ষা চালিয়ে জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে (population) গবেষণার ভাষায় Universal বলা হয়। তবে Population শব্দটিই বেশী জনপ্রিয় ও বেশী ব্যবহৃত হয়। উপাদানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে Population নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একজন প্রকাশক যতগুলি বই প্রকাশ করে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট (finite) কিন্তু ওই প্রকাশকের প্রকাশিত বইয়ের পাঠকের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, **অনির্দিষ্ট** (infinite) Population-কে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়—বাস্তব (real) ও কাল্পনিক (hypothetical or imaginary)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংখ্যা বাস্তব কিন্তু তাদের অনুপ্রেরণার বিষয়গুলি কাল্পনিক কারণ এ ব্যাপারে 'সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। Sampling-এর আলোচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একজন গবেষকের স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

(i) নমুনাকরণের নক্শা (Sampling design) : এটি হল একটি নমুনাকরণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা যাতে population থেকে সঠিক প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা (sample) তৈরি করা সম্ভব হয়।

অর্থাৎ এই নমুনা নির্বাচনে কোন পরিসংখ্যামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে যাতে নমুনা থেকে সমগ্র population সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তাও নক্শার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ii) নমুনা বিভাজন (Sampling distribution) : যেক্ষেত্রে একাধিক নমুনা নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি নমুনার কতকগুলি পরিসংখ্যামূলক পরিমাপ যেমন গড় (mean), সম্যক পার্থক্য (standard deviation), সীমা (range) প্রতিসম্পর্ক (corelation) ইত্যাদি বের করা হয়। এই প্রতিটি নমুনার মান একটি তালিকাকারে প্রকাশ করে নমুনা বিভাজন তৈরি করা হয়। নমুনা বিভাজন থেকে নমুনার আস্থা বা নির্ভরযোগ্যতার স্তর সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ নমুনাটির উপর কতখানি আস্থা রাখা যায়।

ধরা যাক্ একজন গবেষক স্থির করে যে **আস্থার স্তর** 95% (95% confidence level), সেক্ষেত্রে বোঝায় যে প্রতি 100টি নমুনার মধ্যে 95টি নমুনা Populationকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। আস্থার স্তরের বিপরীত ব্যাখ্যা দেয় **তাৎপর্যের স্তর** (significance level) অর্থাৎ কতগুলি নমুনা স্বাভাবিকভাবেই populationকে প্রতিনিধিত্ব করে না। আস্থার স্তর ও তাৎপর্যের স্তর তাই পরস্পরের পরিপূরক। দুই স্তরের যোগফল 100 হয়। তাই আস্থা বা নির্ভরতার স্তর 95% হলে স্বাভাবিকভাবেই তাৎপর্যের স্তর হয় 5%। সুতরাং 5% তাৎপর্যের স্তর (5% significance level) প্রকাশ করে যে প্রতি 100টি নমুনার মধ্যে 5টি নমুনা population-এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

(iii) নমুনার ত্রুটি বা ভুল (Sampling errors) : যেহেতু বৃহৎ জনগোষ্ঠী বা population থেকে একটি অংশ নমুনা বা sample হিসাবে তৈরি করা হয় তাই সব নমুনা সবসময় এবং সম্পূর্ণভাবে Population-এর বিভিন্ন চরিত্র সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবে এ আশা করা যায় না। নমুনা বা sample-এর মধ্যে কিছু ত্রুটির সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায় এমনও দেখা গেছে যে একই **population** থেকে দুটি বা তিনটি নমুনা তৈরী করা হয়েছে তথাপি তাদের ফলাফলের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যকেই **নমুনার ত্রুটি** বা **sampling error** বলা হয়। অন্যদিকে তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে বা তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত ত্রুটি বা মানবিক ত্রুটিগুলিকে **Non sampling error** বলে।

(খ) নমুনা চয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলী (Rules relating to selection of sample) :

নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মটি হল যে মোট জনগোষ্ঠী (Population) থেকে যদি অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক বিষয় উদ্দেশ্যহীনভাবে (at random) নির্বাচন করা হয় তাহলে নমুনার চরিত্র মোট জনগোষ্ঠীর (Population) চরিত্রকে প্রায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন গাছের 1000টি পাতা উদ্দেশ্যহীনভাবে তুলে নেওয়া হয় এবং তাদের গড় দৈর্ঘ্য বের করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে গাছের সমস্ত পাতা তুলে সেগুলির গড় দৈর্ঘ্য বের করলে যে ফল পাওয়া যাবে তা নমুনার ফলের খুবই কাছাকাছি। পরিসংখ্যানগত নিয়মাবলীর উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। এগুলি হল—

(1) নমুনার (sample) সংখ্যা বা আয়তন যত বড় হবে, তার মধ্যে জনগোষ্ঠীর (Population) প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতাও তত বেশী হবে। নমুনার উপর নির্ভরতা বা আস্থা নির্ণয়ের সূত্রটি হল:

নমুনার উপর নির্ভরতা $\propto \sqrt{\text{[illegible]}}$

উপরের উদাহরণ থেকে বলা যায়, যদি গাছটি থেকে 1000টি পাতার বদলে 500টি পাতা নমুনা হিসাবে তোলা হয় তাহলে নমুনার উপর নির্ভরতা কমবে।

প্রথম ক্ষেত্রে, নমুনার উপর, নমুনার উপর নির্ভরতা $= K\sqrt{1000}$ (k ধ্রুবক)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নমুনার উপর নির্ভরতা $= K\sqrt{500}$

সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে, নির্ভরতার মান সেখানে 31·62K, সেখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই মান 22·36K.

(ii) নমুনা অবশ্যই উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে (at ramdom) বাছাই করতে হবে।

উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ওই জনগোষ্ঠীর চরিত্রকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয় যখন একটি জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা চালানো স্থির হয়। কিন্তু শ্রম, সময় ও অর্থের অভাবে সমস্ত জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে লক্ষ্যহীনভাবে নমুনা তৈরী করে তথ্য সংগ্রহ করা সর্বাধিক প্রচলিত উপায়। এই নীতি দাবি করে যে লক্ষ্যহীনভাবে নমুনা নির্বাচন করলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সবধরনের উপাদানই খারাপ, ভাল ও সাধারণ নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে।

তবে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতকগুলি সাবধানতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। নির্বাচন অবশ্যই পক্ষপাতশূন্য (unbiased) হতে হবে। অন্যথায়, নমুনা নির্বাচনে কোন গলদ থাকলে তা সমগ্র জনগোষ্ঠীর চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। সেজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে নমুনা যেন সমগ্র জনগোষ্ঠীর অনুরূপ হয়। আর এরূপ হতে হলে জনগোষ্ঠীর প্রতিটি বিষয়ের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান হতে হবে। 'নমুনায় বেশী সংখ্যক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলে, জাড্যতার সূত্র অনুসারে, নমুনার নির্ভুলতার সম্ভাবনা বেশী হয় এবং নমুনা ছোট হলে নির্ভুলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(গ) নমুনা নির্বাচনের তত্ত্ব (Theory of Sampling) :

নমুনা নির্বাচনের তত্ত্ব বলতে বোঝায় বৃহৎ জনগোষ্ঠী (Population) ও ঐ জনগোষ্ঠী থেকে যে নমুনার নির্বাচন করা হয় ও তদের যে আন্ত:সম্পর্ক থাকে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা। লক্ষ্যহীনভাবে নমুনা নির্বাচনের (random sampling) ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রযুক্ত হয়। বস্তুত: নমুনা নির্বাচনের তত্ত্ব থেকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং সাথে সাথে এই ধারণা যাতে নির্ভুল হয় সে ব্যাপারেও সহায়তা করে। নমুনা নির্বাচন তত্ত্ব যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) পরিসংখ্যানগত পরিমাপ (statistical estimation) : নমুনা নির্বাচন তত্ত্ব নমুনা থেকে পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে জনসমষ্ঠির (population) অজ্ঞাত কোনো চরিত্র নিরূপণ করতে সাহায্য করে। এই পরিমাপ দু' ধরনের হতে পারে—একক বা **বিন্দু গণনা** (point estimate) বা **বিস্তৃত গণনা** (internal estimate)। প্রথম ক্ষেত্রে একটি মাত্র সংখ্যা দ্বারা গণনার ফল প্রকাশ করা হয় ও দ্বিতীয়

ক্ষেত্রে গণনার ফল একটি বিস্তৃতির মাধ্যমে, অর্থাৎ যার একটি নিম্নসীমা ও ঊর্দ্ধসীমা থাকে, প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 10টি যন্ত্রাংশের একটি নমুনায় দেখা গেল যে 1টি যন্ত্রাংশ অকেজো (defective)। সুতরাং বলা যায় যে 100 টি যন্ত্রাংশে অকেজো যন্ত্রাংশের পরিমাণ 10। অনুরূপভাবে যখন এরূপ একাধিক নমুনা পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয় তখন তার ভিত্তিতে বলা যায় যে 100টি যন্ত্রাংশের মধ্যে অকেজো যন্ত্রাংশ থাকার সম্ভাবনা 8 থেকে 12।

(ii) প্রকল্প পরীক্ষা (Tesing of hypothesis) : নমুনা নির্বাচন তত্ত্বের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল প্রকল্পটি পরীক্ষা করে সেটি গ্রহণ বা বর্জন করা। প্রকল্প পরীক্ষায় ফলের যে পার্থক্য দেখা যায় তা দৈবক্রমে (due to chance) ঘটেছে নাকি এই পার্থক্য প্রকৃতই তাৎপর্যপূর্ণ তা জানতে এই তত্ত্ব সাহায্য করে।

(iii) পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্ত (Statistical infernce) : এই তত্ত্ব নমুনার চরিত্র থেকে জনসমষ্টির চরিত্র প্রকাশ করতেও সাহায্য করে। এছাড়াও পরিসংখ্যানমুলক তত্ত্ব নমুনার ফলাফল থেকে জনসমষ্টি সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করে।

(ঘ) গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির গুরুত্ব (Importance of sampling techniques) :

পরিমাণমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির ব্যাপক ব্যাবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব কোনভাবেই হ্রাস করা যায় না। শিক্ষা, অর্থনীতি, বানিজ্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও নমুনা পদ্ধতির ব্যবহার ঘটে। এমনকী আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মেও আমরা নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করি। কারণ শাকসব্জি বা নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করার সময় নমুনা দেখেই আমরা ক্রয়সিদ্ধান্ত নিই, প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডাক্তাররা রুগির এক-দু'ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করেই রক্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নমুনা পদ্ধতির ব্যবহার কেবলমাত্র গবেষণার ক্ষেত্রেই হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রেও আমরা এর ব্যবহার করে থাকি। নমুনা পদ্ধতির যেসব বৈশিষ্ট্যর জন্য এর গুরুত্ব উপলব্ধি হয় সেগুলি হল নিম্নপুপ:

(i) ব্যায়সঙ্কোচ (Economy) : জনসমষ্টির প্রতিটি বিষয় পর্যলোচনা করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, শ্রম সাপেক্ষ, ও সময় সাপেক্ষ। নমুনা নির্বচন পদ্ধতির সাহায্যে ব্যয় সঙ্কোচ করা যেমন সম্ভব হয়, তেমনি শ্রমের অপচয় রোধ করা যায় ও সময় সংক্ষেপেও করা সম্ভব হয়।

(ii) নির্ভরতা (Reliability) : যদি জনসমষ্টির চরিত্র অসদৃশ বা ভিন্নজাতীয় (heterogenous) না হয় এবং সাবধানতার সাথে নমুনা নির্বাচন করা হয়, তাহলে নমুনার ফলাফল জনসমষ্টির কোন বিশেষ চরিত্রকে সঠিকভাবেই প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয় অর্থাৎ নমুনার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যায়।

(iii) পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা (Detailed study) : যেহেতু নমুনায় কম সংখ্যক উপাদান থাকে তাই ঐ উপাদানগুলি সবিস্তারে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও প্রাগাঢ়ভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নমুনাকে বিচার করা হয় বলে ফলাফলে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কমে যায়।

(iv) বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Scientitific base) : নমুনা পদ্ধতির একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। সমগ্র জনসমষ্টি থেকে নমুনা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে করা হয় যাতে নমুনাটি ঝোঁকশূন্য (unbiase) হয়।

(v) অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই অত্যন্ত উপযোগী (Suitability in most situations) : গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব সমীক্ষা চালানো হয় সেগুলির অধিকাংশই নমুনা সমীক্ষা। বৃহৎ জনসমষ্টির উপর সার্বিক সমীক্ষা খুব কম ক্ষেত্রেই চালানো হয়। কারণ জনসমষ্টির চরিত্র যদি সদৃশ হয় তাহলে নমুনার কোন বিশেষ চরিত্র ও জনসমষ্টির চরিত্রের মধ্যে বিচ্যুতি দেখা যায় না। তাই অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই নমুনা পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয়।

গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির ব্যপক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও, একথা সত্য যে নমুনা পদ্ধতি সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। নিচের ক্ষেত্রগুলিতে নমুনা পদ্ধতি খুব একটা কার্যকরী বলে গণ্য হয় না। যেসবক্ষেত্রে এর ব্যবহার আবশ্যিক বলে গণ্য হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) বিশাল উপাত্ত (Data is vast) : যখন গবেষণার জনসমষ্টি বিশাল এবং প্রচুর পরিমাণে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির ব্যবহার খূবই আবশ্যিক।. এর ফলে অর্থ, শ্রম ও সময়ের যেমন সাশ্রয় ঘটে তেমনি গবেষণার জটিলতাও অনেকাংশে হ্রাস পায়।

(ii) যেক্ষেত্রে একশ ভাগ নির্ভুলতার প্রয়োজন হয় না (Where cent percent accuracy is not required) : গবেষণার যেসব ক্ষেত্রে ফলাফল মোটামুটি নির্ভুল হলেও চলে, একশ ভাগ নির্ভুল হওয়ার দরকার হয় না, সেসব ক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই।

(iii) যেক্ষেত্রে জনগণনা সম্ভব নয় (Where census is not feasible) : সাধারণভাবে গবেষণার সমস্ত উপাদান বা জনসমষ্টির (populations) উপর সমীক্ষা চালিয়ে প্রায় একশভাগ নির্ভুল ফলাফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যেক্ষেত্রে জনগণনা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতিই একমাত্র উপযুক্ত উপায় বলে গণ্য হয়। উদাহরণ স্বরুপ, যদি ভারতের খনিজ সম্পদের পরিমাণ জানতে চাওয়া হয় তাহলে ভারতের সমস্ত খনিগুলি খনন করে খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং নমুনা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

(iv) সদৃশ্যতা (Homogeneity) : জনসমষ্টির সামগ্রিক চরিত্র যদি সদৃশ হয় তাহলে নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করা অনেক সহজ হয় ও নমুনার ফলাফল জনসষ্টির চরিত্রকে অনেক বেশী নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়।

তবে একথা সত্য যে নমুনা নির্বাচনে যদি কোন গলদ থাকে অর্থাৎ ঝোঁকশূন্য ও নিরপেক্ষভাবে নমুনা নির্বাচন করা না যায় তাহলে নমুনার ফলাফল গবেষণাকে বিভ্রান্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যদি একটি বস্তির অধিবাসীদের পারিবারিক ব্যয় নির্ধারণ করতে চাই এবং নমুনা সমীক্ষায় যদি সেই পরিবারগুলিকে নির্বাচন করি যাদের পাকা বাড়ি আছে তাহলে প্রাপ্ত ফলাফল বস্তিবাসীদের সঠিক

পারিবারিক ব্যয় নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় না। কারণ নমুনাতে যাদের পাকা বাড়ি নেই তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে নমুনা পদ্ধতি তখনই সফল হয় যখন অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ও নিরপেক্ষভাবে নমুনার উপাদানগুলি নির্বাচন করা হয়। ইচ্ছামত নমুনার উপাদানগুলি নির্বাচন করলে ফলাফলে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কাজেই গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবে ও যত্নসহকারে নমুনা নির্বাচন করে গবেষণার কাজ চালানোই যুক্তিযুক্ত।

(ঙ) নমুনাকরণের পদ্ধতিসমূহ (Mothods of Sampling) :

গবেষণার ক্ষেত্রে বিশাল জনসমষ্টি (population) থেকে ছোট নমুনা নির্বাচন (sampling) করে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কার্যকরী বলে গণ্য হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নমুনা নির্বাচন অবশ্যই বৈজ্ঞনিকভাবে সম্পাদিত হবে অর্থাৎ এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকবে এবং মূল্য জনসমষ্টির সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে সমর্থ হবে। অন্যথায় গবেষণায় বিচ্যুতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় নমুনাকরণ বা নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুসৃত হয় সেগুলিকে প্রধানত: দুটিভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল:

(1) সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণ বা নিরপেক্ষ বা ঝোঁকশূন্য স্যাম্পলিং পদ্ধতি (random sampling method); এবং

(2) সম্ভাবনা রহিত নমুনাকরণ বা ঝোঁকপূর্ণ নন-স্যাম্পেলিং পদ্ধতি (non-random sampling method)।

(1) সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণ বা নিরপেক্ষভাবে নমুনাকরণ পদ্ধতি :

এই পদ্ধতি অনুসারে বৃহৎ জনসমষ্টি (population) থেকে যখন নমুনা (sample) তৈরী করা হয় তখন বৃহৎ জনসমষ্টির প্রতিটি উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে। অর্থাৎ এরুপ নির্বাচন ব্যক্তি নিরপেক্ষ হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নমুনা তৈরী করেন তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নমুনা। নির্বাচনকে প্রভাবিত করে না। এরুপক্ষেত্রে নমুনার প্রতিটি বিষয় বা উপাদান বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে নির্বিচারে ও নিরপেক্ষভাবে তুলে নিয়ে নমুনাটি তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে নমুনা তৈরী করা হলে ব্যক্তিগত ঝোঁক-এর বিষয়টিকে এড়ানো সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির **সুবিধাগুলি** হল নিম্নরুপ :

(i) সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণ তৈরি ও তার কার্যকারিতা জনসমষ্টি সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের উপর নির্ভর করে না।

(ii) সম্ভবনাযুক্ত নমুনাকরণ থেকে অনুমান পাওয়া যায়। এই অনুমানগুলি ঝোঁকহীন ও নিরপেক্ষ এবং নির্ভুলতা পরিমাপযোগ্য।

(iii) যেক্ষেত্রে গবেষণায় এই পদ্ধতি অনুসারে একাধিক নমুনা তৈরী করা হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি নমুনার আপেক্ষিক দক্ষতা নিরুপণ করা সম্ভব হয়, যা' অন্য পদ্ধতিতে নমুনা তৈরী করলে সম্ভব হয় না।

এই পদ্ধতির **অসুবিধাগুলি হল :**

(i) নমুনা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকারীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।

(ii) এরূপ নমুনা নির্বাচনের জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয় এবং আগাম পরিকল্পনা ছাড়া নমুনা তৈরি সম্ভব হয় না।

(iii) এরুপ নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যয় আনুপাতিকভাবে বেশি। নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনারহিত বা ঝোঁকপুর্ণ নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যাবহার করলে খরচ আনুপাতিকভাবে কম হয়।

সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণের ধরণ (Types of probability sampling)

সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণের চারটি ধরণ দেখা যায়। এগুলি হল—

(1) সরল নিরপেক্ষ বা ঝোঁকহীন নমুনাকরণ (simple random sampling);

(2) স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ (stratified sampling);

(3) তন্ত্রমূলক নমুনাকরণ (systematic sampling); এবং

(4) গুচ্ছ নমুনাকরণ (cluster sampling)

এগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

(1) সরল ঝোঁকহীন বা নিরপেক্ষ নমুনাকরণ (simple random sampling) :

একটি নমুনাকরণ পদ্ধতিকে সরল ঝোঁকহীন বা নিরপেক্ষ নমুনাকরণ বলা হয় যখন নমুনার প্রতিটি বিষয় বা উপাদান নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয়। এই পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, যে জনসমষ্টি থেকে নমুনাটি তৈরী করা হয় সেই জনসমষ্টির অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি বিষয় বা উপাদানের নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে। এক্ষেত্রে নমুনা নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়টি একেবারেই গুরুত্ব পায় না। অন্যভাবে বলা যায় যে 'n' সংখ্যক উপাদান বিশিষ্ট কোন নমুনা যদি তৈরী করা হয় তাহলে ঐ n সংখ্যক উপাদান যতগুলি সম্ভাব্য সমবায় (possile combination) গঠন করে তাদের নমুনায় অন্তর্ভূক্তির সম্ভাবনা সমান হলে তাকে **সরল ঝোঁকহীন নমুনাকরণ পদ্ধতি** বলা হয়। এরূপ নমুনা নির্বচনে নিচের প্রণালীগুলির ব্যবহার দেখা যায়:

(a) লটারী পদ্ধতি (Lottry method);

(b) টিপেট-এর সংখ্যা পদ্ধতি (Tippets number method);

(c) আনুক্রমিক তালিকা থেকে নির্বাচন (selection from sequential list); এবং

(d) ঝাঁঝরি বা গ্রিড পদ্ধতি (Grid method)।

এই প্রতিটি পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা নীচে দেওয়া হল।

(a) লটারী পদ্ধতি (Lottery method) : এই পদ্ধতিতে জনসমষ্টির প্রতিটি উপাদান আলাদা করে কাগজে লিখে একটি পাত্রে রাখা হয়। পাত্রের সমস্ত কাগজ ভালভাবে মিশিয়ে সেখান থেকে

একটি করে কাগজ তোলা হয়। এই প্রতিটি কাগজে উল্লিখিত উপাদান নমুনার অন্তর্ভূক্ত হয়। এভাবে যতগুলি উপাদান নিয়ে নমুনাটি গঠন করা স্থির করা হয়, পাত্র থেকে ততগুলি কাগজ তোলা হয়। এভাবে নমুনা নির্বাচনই হল লটারী পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন।

(b) টিপেট-এর সংখ্যা পদ্ধতি (Tippet's numbers method) : এল.এইচ. সি. টিপেট- এর নামানুসারে এই পদ্ধতিটির নামকরণ করা হয়েছে। কারণ **টিপেট** চার অঙ্কের সংখ্যা সম্বলিত এমন একটি তালিকা প্রণয়ণ করেছিলেন যার প্রতি পাতায় সংখ্যাগুলি নিরপেক্ষভাবে লেখা রয়েছে। এই তালিকা থেকে সহজেই ঝোঁকহীন বা নিরপেক্ষভাবে কোন নমুনা তৈরী করা যায়। উদাহরণস্বরুপ, যদি 500 লোকের মধ্য থেকে 50 জন লোকের একটি নমুনা নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করার দরকার হয় তাহলে টিপেটের সংখ্যা তালিকার যেকোন পাতা খুলে 500-এর নীচে প্রথম 50টি সংখ্যা নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বচন বেশ নির্ভরযোগ্য।

(c) আনুক্রমিক তালিকা থেকে নির্বাচন (selection from sequention list) : এই পদ্ধতিতে জনসমষ্টির উপাদানগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে পরপর সাজানো হয়। এই অনুক্রম নামের আদ্যক্ষর বা ভৌগোলিক বা ক্রমিক সংখ্যা অনুসারেও হতে পারে। এভাবে সাজানোর পর যেকোন উপাদানকে নমুনায় অন্তর্ভূক্ত করা যায় এবং নির্বাচন যে কোন জায়গায় থেকে শুরু করা যায়। উদাহরণস্বরুপ, যদি কোন ক্লাসের 100 জন ছাত্রের মধ্য থেকে 10 জন ছাত্রের একটি নমুনা নির্বাচন করা স্থির হয় তাহলে ছাত্রদের রোল নম্বর অনুসারে 5, 15, 25.....95. এই দশজন ছাত্রকে নির্বাচন করা যেতে পারে বা 10, 20, 30.....100 এই রোল নম্বরের 10 জন ছাত্রকে নির্বাচন করে নমুনা তৈরী করা যায়।

(d) ঝাঁঝরি পদ্ধতি (Grid system) : এই পদ্ধতির ব্যবহার সাধারণত: দেখা যায় যখন এলাকাভিত্তিক নমুনা নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতে পুরো এলাকার একটি মানচিত্র তৈরী করা হয়। এরপর ঐ ম্যাপের উপর বর্গক্ষেত্রসম্বলিত একটি পর্দা বসানো হয় এবং কতকগুলি বর্গক্ষেত্র নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয়। নির্বচিত বর্গক্ষেত্রগুলি মানচিত্রের যে এলাকাকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে নমুনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

● সরল নিরপেক্ষ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমুহ (Merits and demerits of simple random sampling) :

এই পদ্ধতির নিমোক্ত সুবিধাগুলি দেখা যায় :

(i) পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত সরল এবং গবেষক বা নমুনা নির্বচনকারীকে নমুনায় কোন বিষয়টিকে নির্বাচন করা হবে এবং কোন বিষয়টিকে নির্বাচন করা হবে না এব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয় না।

(ii) এই পদ্ধতিটি ঝোঁকশূন্য ও নিরপেক্ষ হওয়ায় নমুনা নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থাকে না।

(iii) যেহেতু বৃহৎ জনসমষ্টির (population) প্রতিটি উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে সেহেতু নমুনা মুল জনসমষ্টিকে অনেক ভালভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

(iv) এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে নিয়মানুগ হওয়ায় ফলাফলে যদি কোন ত্রুটি দেখা যায় তাহলেও তা দূর করা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) জনসমষ্টির আকার ও আয়তন খুব বড় হলে এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন সবসময় সম্ভব হয় না।

(ii) এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচনকারীর নমুনার উপাদান নির্বাচনে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলত: নির্বাচিত উপাদানগুলির বিস্তৃতি খুব বেশী হতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

(iii) জনসমষ্টির চরিত্র অসদৃশ (heterogeneous) হলে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হয় না।

2. স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ (Stratified sampling) :

এই পদ্ধতিতে প্রথমে সমগ্র জনসমষ্টিকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি শ্রেণীকে স্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। এরপর এই প্রতিটি স্তর থেকে নমুনার বিষয় বা উপাদানগুলিকে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয়। এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে জনসমষ্টিকে উপ-দলে বা উপ-বিভাগে বিভক্ত করার প্রক্রিয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সঠিক স্তর বিন্যাসের জন্য নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

(i) জনসমষ্টির প্রতিটি স্তর যেন যথেষ্ট বড় হয় যাতে নিরপেক্ষভাবে নমুনা নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হয়।

(ii) প্রতিটি স্তরের উপাদান বা বিষয়গুলির চরিত্র যেন সদৃশ হয়।

(iii) প্রতিটি স্তর যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রতিটি স্তরের উপাদানগুলি যেন অন্যস্তরের উপাদানগুলির দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত না হয়।

গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত: **তিন ধরনের** স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। এগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) আনুপাতিক স্তরভিত্তিক নমুনা নির্বাচন (Proportionate stratified sampling) :

এই পদ্ধতিতে যে অনুপাতে মোট জনসমষ্টি থেকে বিভিন্ন স্তরবিন্যাস করা হয় সেই একই অনুপাতে বিভিন্ন স্তর থেকে নমুনার উপাদান নির্বাচন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন জনসমষ্টি থেকে 5 টি স্তরের উদ্ভব ঘটে তাহলে প্রতিটি স্তর থেকে 5টি বিষয়কে নির্বাচন করে নমুনায় গঠন করা হয়। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই অনুপাত হল 1 : 5।

(ii) অনুপাতরহিত স্তরভিত্তিক নমুনা নির্বাচন (Disproportionate stratified sampling) :

এই পদ্ধতিতে প্রতিটি স্তর থেকে সমান সংখ্যাক উপাদান নির্বাচন করে নমুনাটি গঠন করা হয়।

অর্থাৎ জনসমষ্টি ও স্তরের অনুপাতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। এই পদ্ধতিটিকে 'নিয়ন্ত্রিত নমুনা নির্বাচনও' (controlled sampling) বলা হয়।

(iii) স্তরভিত্তিক ভারযুক্ত নমুনা নির্বাচন (Stratified weight sampling) :

যেক্ষেত্রে জনসমষ্টি থেকে গঠিত স্তরগুলির আকার ও আয়তন বিভিন্ন হয় সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি স্তর থেকে সমপরিমাণ উপাদান প্রথমে নির্বাচন করা হয় এবং ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে তাদের গড় বের করা হয়। কোন স্তরের উপর কতটা ভার আরোপ করা হবে তা নির্ভর করে মোট জনসমষ্টির আকারের সাথে ঐ স্তরের আকারের অনুপাতের উপর। এভাবে নমুনা নির্বাচনই হল স্তরভিত্তিক ভারযুক্ত নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি।

● স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Merits and demerits of stratified sampling method) :

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) এই পদ্ধতিতে নমুনার উপাদানগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচকের অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণ থাকে। কারণ সরল নিরপেক্ষ বা ঝোঁকশূন্য নমুনাকরণ পদ্ধতিতে (simple random sampling method) কোনো গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর নমুনাতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ পদ্ধতিতে এই সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।

(ii) এই পদ্ধতিতে খুব কম সংখ্যক উপাদান নিয়েই জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা গঠন করা সম্ভব হয়। এমনকি, যেক্ষেত্রে স্তরগুলি সদৃশ প্রকৃতির সেক্ষেত্রে অতি অল্প সংখ্যক উপাদান নিয়েই নমুনা তৈরি করা যায় অথচ ফলাফলের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি দেখা যায় না।

(iii) এই পদ্ধতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, যেসব বিষয় অগম্য (inaccessible) সেগুলি সুগম বিষয়গুলি দ্বারা প্রতিস্থাপন (replacement) করা সম্ভব হয়।

অপরদিকে এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) এই পদ্ধতি জনসমষ্টির স্তরবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন গলদ থাকলে তা নমুনা গঠনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযুক্ত হয়।

(ii) স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার সেভাবে ঘটে না। নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করেই স্তরগুলি গড়ে তোলা হয়। তাই স্তরগুলি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়, যা পরবর্তী সময়ে সমস্যার সৃষ্টি করে।

(iii) স্তরভিত্তিক ভার যুক্ত নমুনাকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভার আরোপ করা হয় তা কম বা বেশী হলে নমুনাটির আদর্শমান বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

3. তন্ত্রগত নমুনাকরণ (Systematic sampling) :

তন্ত্রগত নমুনাকরণ প্রকৃতপক্ষে সরল নিরপেক্ষ নমুনাকরণের একটি অন্য সংস্করণ বা ধরন। এই

পদ্ধতিতে জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বিষয় বা উপাদানগুলি প্রথমে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে প্রতিটি উপাদানই তালিকায় সঠিকভাবে বিন্যস্ত থাকে। ভোটার তালিকা, টেলিফোন ডাইরেক্টরী এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে ধরা যাক, 500টি উপাদান বিশিষ্ট জনসমষ্টি থেকে 50টির একটি নমুনা গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে 1থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে আমরা যেকোন একটি সংখ্যা নিরপেক্ষভাবে বেছে নিতে পারি। ধরা যাক্ সংখ্যাটি হল 6 তাহলে তালিকার 6,16,26.36.....486,496 অবস্থানের উপাদানগুলি নিয়ে নমুনাটি গঠন করা হবে, এভাবে নমুনা গঠন করার পদ্ধতিটিই হল তন্ত্রগত নমুনাকরণ।

এই পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট হল যে নমুনার উপাদানগুলি একটি অনুক্রম (sequcnce) অনুসারে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি নির্বাচিত উপাদানের মধ্যে সমান অন্তর বর্তমান থাকে। তবে তালিকায় উপাদানুগুলির অবস্থানের উপরই নমুনার নির্ভরযোগ্যতা মূলত: নির্ভর করে।

এই পদ্ধতির সুবিধা হল নিম্নরুপ:

(i) নমুনা তৈরি করা সহজ ;

(ii) কালান্তিক উপাদান সম্বলিত জনসমষ্টি ব্যতিরেকে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরি বলে গন্য হয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল—

(i) নমুনার উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক দুটি উপাদানের মধ্যে পার্থক্য যদি খুব বেশী হয় তাহলে নমুনার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। তাই খুব বড় জনসমষ্টি থেকে ছোট নমুনা তৈরী করার ক্ষেত্রে উপযোগী নয়।

(ii) জনসমষ্টির মধ্যে একাধিক স্তরের উপস্থিতি থাকলে ত্রুটি বা বিচ্যুতি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কাজেই এরূপক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি উপযোগী বলে বিবেচিত হয় না।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল নিম্নরুপ:

(i) যদি জনসমষ্টির উপাদানগুলির তালিকায় সাজানোর ভিত্তি কালান্তিক হয় তাহলে নমুনা সুস্থিত না হয়ে পরিবর্তনশীল হয়। ফলে নমুনা জনসমষ্টির চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না।

(ii) যেক্ষেত্রে জনসমষ্টির উপর স্তরবিন্যাসের প্রভাব থাকে সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে নমুনা তৈরী করা হলে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(iii) তালিকা থেকে নমুনার উপাদানগুলি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নির্বাচন করা হয়। এরূপ প্রতিটি উপাদানের মধ্যে পার্থক্য বা অন্তর যদি খুব বেশী হয় তাহলে নমুনাটিকে আদর্শ নমুনা বলা যায় না।

(4) গুচ্ছ নমুনাকরণ (cluster sampling) :

গুচ্ছ নমুনাকরণকে বহুস্তর নমুনাকরণও বলা হয়। কারণ এই পদ্ধতিতে নমুনা অনেকগুলি স্তর বা ধাপের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। যখন বিশাল জনসমষ্টি (population) থেকে নমুনা নির্বাচনে এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত: তিনটি বা চারটি ধাপে বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে নমুনাটি তৈরি

করা হয়। প্রথম ধাপে প্রথম শ্রেণীর উপাদানগুলি নির্বাচন করা হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে এই উপাদানগুলির উপবিভাগ তৈরি করা হয় এবং তৃতীয় ধাপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর উপাদানগুলি নিয়ে নমুনা তৈরি করা হয়।

এই পদ্ধতিটি আনুপাতিকভাবে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা জটিল। একটি উদাহরণের মাধ্যমে পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করলে বোঝার সুবিধা হয়। ধরা যাক্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজে যুক্ত রয়েছে এরূপ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের থেকে একটি 100 জনের নমুনা নির্বাচন করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তালিকায় 100টি পৃষ্ঠা রয়েছে এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় 20 জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নাম তাঁদের নামের আদ্যক্ষর (alphabetically) অনুযায়ী সাজানো রয়েছে। এমত অবস্থায় 100টি পৃষ্ঠা থেকে নিরপেক্ষভাবে 20টি পৃষ্ঠা প্রথমে নির্বচন করা হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপে প্রতি পৃষ্ঠা থেকে নিরপেক্ষভাবে 5টি নাম নির্বাচন করা হয়। সুতরাং 100টি পৃষ্ঠা থেকে 20টি পৃষ্ঠা নির্বাচন করার জন্য 1থেকে 5 এর মধ্যে যে কোনো একটি সংখ্যা নির্বাচন করতে হয়। মনে করা হল সংখ্যাটি 4, তাহলে নির্বাচিত পৃষ্ঠাগুলি হবে 4,8,12,16.....96 ও 100। এরপর নির্বাচিত প্রতিটি পাতা থেকে নিরপেক্ষভাবে 5টি নাম বেছে নেওয়া হলে 100টির একটি নমুনা তৈরি হবে। সুতরাং এই পদ্ধতিটি প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র নমুনাকরণ পদ্ধতি (systemtic sampling) ও সরল নিরপেক্ষ নমুনাকরণ (simple random sampling) -এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

তবে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুব বেশী হয় না। কারণ পদ্ধতিটি ব্যয়সাপেক্ষ এবং নমুনাকরণ-বহির্ভূত ত্রুটির (non-sampling error) উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা জটিল।

(2) সম্ভাবনাহীন নমুনাকরণ পদ্ধতিসমূহ (Non-probability sampling methods) :

সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণ পদ্ধতি (Probability sampling method) সম্বন্ধে জানার সাথে সাথে আমাদের সম্ভাবনাহীন নমুনাকরণ পদ্ধতি (Non-probability sampling method) সম্বন্ধেও ধারণা গড়ে তোলা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে যে নমুনাকরণ পদ্ধতিতে বৃহৎ জনসমষ্টি (propulation) প্রতিটি উপাদানের নমুনায় নির্বাচন হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে না সেই পদ্ধতিকেই সাধারণভাবে সম্ভাবনাহীন নমুনাকরণ পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে নমুনার উপাদানগুলি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে নমুনা গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া আংশিক পছন্দ-ভিত্তিক অর্থাৎ নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত মতামত ও পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো উপাদানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি সম্ভাবনার উপর যতটা না নির্ভর করে তার চেয়ে নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত বিচারবোধ ও সুবিধা-অসুবিধার উপর বেশী নির্ভর করে। এরূপ নমুনাকরণ পদ্ধতিকে **তিনটি** ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হল—

(i) বিচারভিত্তিক বা উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনাকরণ (Judgement or purposive sampling);

(ii) সুবিধাজনক নমুনাকরণ (Convenience sampling); এবং

(iii) অংশ নমুনাকরণ (Quota sampling)।